Contents

গবেষণাপত্র সংকলন-১৫

'আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন 'আলী আশ্ শাওকানী জীবন ও কর্ম

ড. মোঃ ছামিউল হক ফারুকী

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

Contents

গবেষণাপত্র সংকলন-১৫

‘আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন ‘আলী আশ্ শাওকানী: জীবন ও কর্ম

ড. মোঃ ছামিউল হক ফারুকী

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

Contents

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, ফ্যাক্স : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশন :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

প্রকাশকাল : নভেম্বর, ২০১০
অগ্রহায়ণ, ১৪১৭
যুলহিজ্জা, ১৪৩১

ISBN : 984-843-029-0 set

প্রচ্ছদ : গোলাম মাওলা

মুদ্রণ : আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Gobesanapatra Sankalan-15 Written by Dr Mohammad Samiul Haque Faruque and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition November 2010 Price Taka 50.00 only.

প্রকাশকের কথা

ড. মুহাম্মাদ ছামিউল হক ফারুকী ১লা এপ্রিল, ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত স্টাডি সেশনে **"আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু আলী আশ্‌ শাওকানী : জীবন ও কর্ম"** শীর্ষক একটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন।

উপস্থাপিত গবেষণাপত্রটির উপর জ্ঞান-গর্ভ আলোচনা পেশ করেন ড. মুহাম্মাদ আবদুল মা'বুদ, ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ, অধ্যাপক আ.ন.ম. রফীকুর রহমান, অধ্যক্ষ এ.কিউ.এম. আবদুল হাকীম, ড. মুহাম্মাদ নজীবুর রহমান, ড. মুহ্‌মমাদ ছাইদুল হক, ড. আ.ছ.ম. তরিকুল ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, ড. মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ শফিউল আলম ভূইয়া, ড. যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক, জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম ও জনাব মুহাম্মাদ আতহার উদ্দীন।

সম্মানিত গবেষক বিজ্ঞ আলোচকদের পরামর্শের নিরিখে গবেষণাপত্রটি পরিমার্জিত করেন।

আল্লামা আশ্‌ শাওকানী একজন বড়ো মাপের চিন্তাবিদ। তাঁর সম্পর্কে বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের তেমন একটা অবগতি নেই।
ড. মুহাম্মাদ ছামিউল হক ফারুকী প্রণীত এই গবেষণাপত্রটি এই অভাব পূরণ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আমরা আশা করি গবেষণাপত্রটি বিপুলভাবে সমাদৃত হবে।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন!

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

Contents

সূচীপত্র

Contents

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, জ্ঞান-গবেষণার অন্যতম পুরোধা মুহাম্মাদ ইবন 'আলী আশ্ শাওকানী। জ্ঞান-গবেষণা, অধ্যাপনা, গ্রন্থ রচনা ও বহুমুখী কর্মকান্ডের মাধ্যমে যে সকল মনীষী অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন, তাঁদের একজন হলেন তিনি। আশ্ শাওকানী ছিলেন একাধারে চিন্তাবিদ, গবেষক, লেখক, অধ্যাপক, সুসাহিত্যিক, কবি, আইনবিদ ও যোগ্য বিচারক। সমসাময়িক প্রায় সকল বিষয়েই তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ।

"আল্লামা আশ্ শাওকানী সে যুগের একজন সুযোগ্য মুজতাহিদ ছিলেন। তিনি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে তুলে ধরেছেন। তিনি মাযহাব ও ব্যক্তি বিশেষের তাকলীদ তথা অন্ধ অনুকরণের আবর্ত থেকে বেরিয়ে মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তা অনুশীলনের পথে পা বাড়ান।

ইজতিহাদ অর্থাৎ চিন্তা-গবেষণা করে মাসয়ালা চয়নে তিনি ছিলেন খুবই পারদর্শী। ইসলামী আইনশাস্ত্রে তাঁর ছিল বিশেষ পান্ডিত্য। বিভিন্ন বিষয়ে আইনী ব্যাখ্যা তথা ফাতওয়া দানের ক্ষেত্রে আশ্ শাওকানী অনন্য যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। বিচার কার্যেও তাঁর দক্ষতা এবং যোগ্যতা ছিল সুবিদিত।

তিনি শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন এবং লিখনীর মাধ্যমে এগুলোর বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়েছেন।

আমৃত্যু জ্ঞান সাধক এই মনীষী বহু সংখ্যক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর লেখা বইয়ের সংখ্যা শতাধিক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী এ মহান মনীষীর বহুমুখী অবদান সত্ত্বেও তাঁর জীবন সম্পর্কে সবিস্তারে তেমন কিছু জানা যায় না। বিভিন্ন গ্রন্থে বিচ্ছিন্নভাবে তাঁর সম্পর্কে যা কিছু আলোচনা হয়েছে, তা খুবই অপ্রতুল। বলা যায় কীর্তিমান এ মহাপুরুষের জীবনী অনেকটাই লোক চক্ষুর অন্তরালেই রয়ে গেছে।

আশ্ শাওকানীর কর্মময় জীবন ও চিন্তাধারাকে সাধারণ্যে পরিচিত করানোর জন্যই মূলত এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। **"মুহাম্মাদ ইবন 'আলী আশ্ শাওকানী : জীবন ও কর্ম"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভে তাঁর জীবনী, কর্ম ও চিন্তাধারার আলোচনা পেশ করা হয়েছে। আশা করি পাঠকবর্গ এ অভিসন্দর্ভের মাধ্যমে 'আল্লামা আশ্ শাওকানীর জীবনের বিভিন্ন দিক অবগত হয়ে উপকৃত হতে পারবেন।

প্রথম অধ্যায়

'আল্লামা আশ্ শাওকানীর সমকালে মুসলিম বিশ্বের অবস্থা

আশ্ শাওকানীর সমসাময়িক কাল অর্থাৎ হিজরী দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী (খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দী) ছিল মূলতঃ মুসলিমদের অধ:পতনের যুগ। অভ্যন্তরীণ কোন্দল, সাম্প্রদায়িক ও উপদলীয় কোন্দল, শাসকদের দুর্বলতা প্রভৃতি কারণে ইসলামী খিলাফাত দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েছিল। অধিকন্তু বহিশত্রুর নানামুখী আক্রমণ ও ষড়যন্ত্রের কারণে এ খিলাফাত ভঙ্গুর অবস্থায় এসে দাঁড়িয়ে ছিল।

উসমানিয়া খিলাফাত

এ সময় ইউরূপ এবং এশিয়া মাইনর জুড়ে উসমানিয়া সালতানাত ব্যাপৃত ছিল। এতদ্ব্যতীত প্রায় সমগ্র আরব জাহান (মিশর, শাম, ইরাক, ইয়ামান, নজ্‌দ, হিজায এবং উত্তর আফ্রিকার এক বিরাট অংশ) এর করতলগত ছিল। ইসলামের দৃষ্টিতে পবিত্র স্থানসমূহের অভিভাবকত্ব, ইসলামী খিলাফাতের ধারক-বাহক ও সংরক্ষক এক বড় শক্তি, পশ্চিমা বিশ্ব ও ইসলাম বিরোধী শক্তির নিকট এটি ইসলামী শক্তির নিদর্শন এবং ইসলাম ও ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির সংরক্ষক হওয়ার কারণে সারা দুনিয়ার মুসলিমদের নিকট এটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানের পাত্র। ফলে এখানকার সংঘঠিত ঘটনাবলী বিশ্বের সকল মুসলিমের ওপর প্রভাব ফেলত।

শাওকানীর সময় মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক অবস্থা

আশ শাওকানীর জন্ম ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে (হিজরী ১১৭৩ সাল) এবং মৃত্যু ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে (হিজরী ১২৫০ সাল)। অষ্টাদশ শতাব্দীর (হিজরী দ্বাদশ শতাব্দী) প্রারম্ভে ইসলামী বিশ্ব মধ্য ইউরোপ হতে মধ্য এশিয়া এবং মরক্কো হতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত এলাকায় বিস্তৃত ছিল। ৩০০ বছরেরও অধিক সময় এর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ছিল তুর্কী বংশোদ্ভূত লোকদের হাতে। উসমানীয়গণ ছাড়াও পশ্চিমে এর নিয়ন্তা ছিল সাফাভীয়গণ এবং ভারতবর্ষে মোগলগণ।[১]

এ তিন সাম্রাজ্যের লোকেরা একই তুর্কী বংশের এবং সকলেই মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তারা কখনো এক হতে পারেনি এবং পরিকল্পনায় একে অপরকে সহযোগিতা করেনি। এদের পরস্পরের মধ্যে সুদূর ব্যবধান এবং যোগাযোগের অভাব কিছুটা দায়ী হলেও মূলতঃ ধর্মীয় আকীদাগত পার্থক্যই ছিল এর প্রধান কারণ।

---

১. ইয়াহইয়াহ আরমাজানী, Middle East Past & present, বঙ্গানুবাদ মুহাম্মদ ইনাম-উল হক (ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৮ ইং) পৃ. ২০৩।

সাফাভীয় শাসনাধীন ইরান ছিল শিয়া মতাবলম্বী এবং এর ভৌগলিক অবস্থান মধ্যবর্তী স্থানে হওয়ায় উসমানিয়া ও মোগল- এ দু'টি সাম্রাজ্যকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। উসমানীয়দের সাথে ইরানের সাফাভীদের দ্বন্দ্ব ছিল। গোঁড়া ধর্মীয় শত্রুতা, দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার নাজাফ ও কারবালায় অবস্থিত শিয়া সম্প্রদায়ের পবিত্র স্থানগুলির কর্তৃত্ব নিয়ে এবং পূর্ব এশিয়া মাইনরে শিয়া বসতিগুলির বিবাদের দ্বারা এ দ্বন্দ্ব আরো প্রকট আকার ধারণ করে। অর্থনৈতিক এবং ভাষাগত কারণেও উভয়ের মধ্যে শত্রুতা ছিল। উসমানিয়া সাম্রাজ্য ইরান ও ভূমধ্য সাগরকে সংযুক্তকারী চিরাচরিত বাণিজ্য পথ দার্দানালিসে ও বসফরাস প্রণালীতে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত ছিল। বাণিজ্য পথ নিয়েও উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। অধিকন্তু ভাষাগত পার্থক্যও উভয়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে রেখেছিল। আজারবাইজান ও উত্তর-পশ্চিম ইরানের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী ছিল তুর্কীভাষী। উভয়ের মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য, ধর্মীয় গোঁড়ামী ও অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহ এ দু'টি জাতিকে বিভক্ত করে রাখে এবং একটিকে 'পারস্যবাসী' আর অন্যটিকে 'তুর্কী' বলে চিহ্নিত করে।[২২]

তবে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইরানের সম্পর্ক খারাপ ছিল না। ভারতবর্ষ রাজনৈতিকভাবে তুর্কিস্তান ও আফগানিস্তানের প্রভাবাধীন থাকলেও শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও চিন্ত াজগতে কমবেশী ইরানের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। সাহিত্য, কাব্য, সুফিবাদের সিলসিলা ও কর্মপন্থা এমনকি পাঠ্যসূচী ও শিক্ষানীতিতে ইরানের প্রভাব ছিল একচেটিয়া।। সেখানকার পন্ডিত ও শিক্ষাবিদদের পুস্তকাদি ভারতবর্ষের মন-মস্তিস্ককে অচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। বিশেষত: আকবরের শাসনামলে আমীর ফাতহুল্লাহ শিরাজী এবং হাকীম আলী গিলানীর ভারতে আগমনের পর ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং ইলমে হিকমাতের (বিজ্ঞান শিক্ষা) ক্ষেত্রে ইরানের পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের অধিকাংশ দেশে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের সূচনা হলেও ইসলামী বিশ্বে স্থবিরতা পরিলক্ষিত হয়। মোগল সাম্রাজ্য তখন পতনের সম্মুখীন এবং পাশ্চাত্যের (বৃটিশ) বেনিয়া অভিযাত্রীদের দু:সাহসিক শিকারে পরিণত হয়। ওদিকে সাফাভীয়গণও ধ্বংসের পথে ধাবিত হয়। উসমানীয়গণ সাম্রাজ্যের বৃহৎ আকারের কারণে তখনও শক্তিশালী ছিল বটে কিন্তু তাও ধীরে ধীরে পতনের দিইে যাত্রা শুরু করে।[৪]

---

২. প্রাগুক্ত।

৩. সাইয়্যেদ হাসান আলী নদভী, তারীখে দাও'য়াত ওয়া আযীমাত (লক্ষ্নৌ : মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম, ২০০ইং) খ. ৫, পৃ. ১৮।

৪. ১৭৫৭ সালে ২৩ জুন পলাশীর আম্র কাননে মীর জাফরসহ কতিপয় বিশ্বাসঘাতকের ষড়যন্ত্রের ফলে বৃটিশদের হাতে সিরাউদ্ দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে মোগল সাম্রাজ্যের পতন সূচিত হয়।

'আল্লামা আশ্ শাওকানীর সমকালে যে ৪ জন শাসক উসমানীয় সাম্রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় ছিলেন তাঁরা হলেন : তৃতীয় মুস্তাফা (১৭৫৭–১৭৭৩ খৃ.) প্রথম আব্দুল হামিদ (১৭৭৪–১৭৮৯ খৃ.), দ্বিতীয় সেলিম (১৭৮৯–১৮০৭ খৃ.) এবং দ্বিতীয় মাহমুদ (১৮০৮–১৮৩৯ খৃ.)।

এ সময় উসমানীয় সাম্রাজ্য নিয়ে ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত সূচিত হয়। এ সাম্রাজ্যের ব্যাপারে সে সময়ে ইউরোপের ছয়টি বৃহৎ শক্তি জড়িয়ে পড়ে। এ শক্তিগুলো হলো : অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী, রাশিয়া, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী ও ইতালী।

উসমানীয় সাম্রাজ্য নিয়ে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের দ্বন্দ্ব-সংঘাতই পতনোন্মুখ এ সাম্রাজ্যটিকে দীর্ঘদিন টিকে থাকতে সাহায্য করে। এ প্রসঙ্গে ইয়াহইয়া আরমাজানী বলেন, "এতদ্‌সত্ত্বেও স্বীয় ভার ও দুর্নীতির ফলেই উসমানীয় ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িত, যদি না ইউরোপীয় জাতিগুলি কখনও একাকী এবং প্রায়ই সম্মিলিতভাবে এই নড়বড়ে সাম্রাজ্যকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য যথেষ্ট রক্ত সঞ্চালন করিত। ইউরোপীয় ইতিহাসে প্রাচ্য প্রশ্ন বলিতে যাহা বুঝায় তাহার মূল হইল এই রুগ্ন লোকটির মৃত্যুর পর ইহাকে ভাগবাটোয়ারা করিয়া লইবার ব্যাপারে পাশ্চাত্যের অক্ষমতা। ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে কেউই অন্যান্য শক্তিগুলিকে পরাজিত করিয়া এই সাম্রাজ্যের মালিক হইবার মতো যথেষ্ট ক্ষমতাশালী ছিল না। ইতোমধ্যে প্রত্যেকটি শক্তি ভীত ছিল পাছে অন্য কোন শক্তি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। নির্দয় ষড়যন্ত্র, গোপন চুক্তি, প্রতারণা এবং যুদ্ধ এই সমস্ত ছিল কূটনৈতিক যুদ্ধের অংশবিশেষ। যখনই কোনো দেশ বা কয়েকটি দেশের সমষ্টি প্রাধান্য লাভ করে তখন অবশিষ্ট দেশগুলি ভারসাম্য ফিরিয়া আসা র্পন্ত ওসমানীয়দের সাহায্যে আগাইয়া আসে। যখন ইহা পরিস্কার হইয়া যায় যে, ইউরোপীয় ভারসাম্য রক্ষা করিবার জন্য এই সাম্রাজ্যকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে তখন গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স এবং পরে জার্মানির ন্যায় কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ শোষণের ক্ষেত্রে ওসমানীয়দের গুটিকয়েকের শাসনে অংশগ্রহণ করে এবং এই অবস্থাকে দীর্ঘজীবি করে। কিন্তু ইহা কার্যকরী হইবার পক্ষে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী যেমন ছিল খুবই বেসামাল এবং ঠিক তেমনি রাশিয়া বাস্তব হইবার পক্ষে ছিল খুবই মেসিয়ানিক প্রভাবমুক্ত। বস্তুতঃ প্রথম মহাযুদ্ধের

১৭৭৯ সালে করীম খান জন্দএর মৃত্যুর পর তুর্কী কাজার বংশের আগা মুহাম্মাদ এর ক্ষমতা হস্ত গত করার মাধ্যমে সাফাভীয় শাসনের অবসান ঘটে।

উসমানীয় সাম্রাজ্য নিয়ে ইউরূপীয়দের প্রতিযোগিতার কারণে এটি আরো ২০০ বছর টিকে ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০ সালে মুস্তাফা কামালের তুরস্কে ক্ষমতায় আরোহণের মধ্য দিয়ে উসমানীয় সাম্রাজ্যের সমাপ্তি ঘটে।

পরেও ইউরোপীয় শক্তিগুলি ওসমানীয়দিগকে জীবিত রাখিতে চেষ্টা করে এবং তাহারা সফলতাও লাভ করিত যদি না তুর্কিগণ স্বয়ং সহজমরণ প্রণালী ব্যবহার করিয়া মৃতদেহকে কবর দিত।"[৫]

অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়া প্রধানত: উসমানীয়দের ইউরোপীয় এলাকাগুলোর ব্যাপারে আগ্রহী ছিল। ফলে তাদের আগ্রহ প্রায়ই সংঘর্ষে রূপ নিত। সুলতান তৃতীয় মুস্তাফার শাসনামলে রাশিয়া এবং উসমানীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়।

রাশিয়া ও প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ফ্রান্সের পঞ্চদশ লুই সুলতান মুস্তাফাকে তার অপ্রস্তুত সেনাবাহিনী নিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করার চেষ্টা করে। রাশিয়ার রাণী ক্যাথরীন এ সুযোগকে কাজে লাগায় এবং রুশ নৌবহরকে ইউরোপ ঘুরিয়ে ভূমধ্য সাগরের তুরস্কের উপকূলে উপস্থিত করে। রুশগণ এ যুদ্ধে চিয়স ও চিসমে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। তারা উসমানীয় নৌবহরকে সম্পূর্ণ ধবংস করে দেয়। রুশ জেনারেল ইস্তাম্বুল আক্রমণেরও ইচ্ছা করে, কিন্তু সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেও ইস্তাম্বুল পৌঁছতে সক্ষম হয়নি।[৬]

রুশ বাহিনী প্রথম দিকে সাময়িকভাবে বিজয় লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারেনি। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে ক্যাথরিনকে স্বীকার করতে হয় যে, "নৌবহর কিছুই করতে পারছেনা"। অপর দিকে স্থল যুদ্ধও ছিল মন্থর ও কালক্ষেপনকারী। যুদ্ধের এ অবস্থা দর্শনে প্রুশিয়ার ফ্রেডারিককে সকৌতুকে মন্তব্য করতে শুনা যায় যে,"ইহা একটি খোঁড়া ও কানার মধ্যে অনুষ্ঠিত যুদ্ধ"।[৭]

সুলতান তৃতীয় মুস্তাফা সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং সামরিক সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। ফলে কিছু সামরিক সফলতাও অর্জিত হয়। শেষ পর্যন্ত রাশিয়া সন্ধির জন্য কিছু শর্তারোপ করে। ৯ নভেম্বর ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে বুখারেষ্টে উভয়ের মধ্যে একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সন্ধির কিছু শর্ত অবমাননাকর হওয়ায় সুলতান তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং তুর্কী সেনাবাহিনীকে যুদ্ধ শুরুর নির্দেশ দেন। এই যুদ্ধে রুশ বাহিনী সম্পূর্ণ পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়।[৮]

দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সের প্রধান স্বার্থ ছিল অর্থনৈতিক এবং ইউরোপের ভারসাম্য রক্ষা করা। ভূখন্ডের উপর তাদের কোন উদ্দেশ্য থাকলেও তা তেমন মুখ্য ছিল না। তাদের ভূখন্ডগুজনিত উদ্দেশ্য নিহিত ছিল উসমানীয় সাম্রাজ্যের অধিনস্থ আফ্রিকা ও এশিয়ার রাজ্যগুলোর উপর। গ্রেট বৃটেনের রাজকীয় নীতি নির্মিত

---

৫. ইয়াহইয়া আরমাজান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫।
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯।
৭. প্রাগুক্ত।
৮. সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

ছিল ভারতবর্ষের নিরাপত্তা এবং এর দিকে পরিচালিত প্রধান পথগুলোর উপর। মধ্যপ্রাচ্যে এর নজর ছিলো পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগর এবং এগুলোর চতুর্দিকের স্থানগুলোর উপর।[৯]

ফ্রান্স প্রধানত: আগ্রহী ছিল উত্তর আফ্রিকা ও লেবাননের ব্যাপারে। লেবানন সীমান্ত যেহেতু সর্বদা সন্দেহজনক ছিল তাই ফ্রান্স এবং গ্রেট বৃটেন এটি নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হতো। এ ছাড়া উসমানীয় সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট অংশে ফ্রান্সের স্বার্থ ছিল অর্থনৈতিক ও ধর্মীয়। উসমানীয় সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি স্থাপনকারী প্রথম দেশসমূহের মধ্যে ফ্রান্স ছিল অন্যতম এবং কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এ চুক্তি অনেকবার পুন:স্থাপিত হয়। ফরাসী ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও মহাজনগণ উসমানীয় সাম্রাজ্যে ব্যাপকহারে টাকা বিনিয়োগ করে। ধর্মীয় ক্ষেত্রে অর্থোডক্স প্রজাদের ব্যাপারে রুশরা যেমন আগ্রহী ছিল ফরাসীগণও রোমান ক্যাথলিক প্রজাদের ব্যাপারে অনুরূপ আগ্রহী ছিল। ফিলিস্তিনের খ্রিস্টান পবিত্র স্থানগুলোর উপর যেহেতু অর্থোডক্স ও রোমান ক্যাথলিক উভয়ে কর্তৃত্ব দাবী করত তাই রাশিয়া ও ফ্রান্স এ নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হতো।[১০]

জার্মানী ও ইতালি ছিল এ দৃশ্যপটে নবাগত। জার্মানীর স্বার্থ ছিল প্রধানত: অর্থনৈতিক এবং রাশিয়া ও ইংল্যান্ডের পরিকল্পনায় বাধা প্রদান করার জন্য সুলতানের উপর প্রাধান্য বিস্তার করা। ইতালির ভূমিকা ছিল বৈশিষ্টহীন। কিন্তু অন্যান্যরা যখন অন্যত্র ব্যস্ত সে তখন লিবিয়ার উপর কর্তৃত্ব লাভ করে।[১১]

ইউরোপীয় শক্তিসমূহের একে অপরের সাথে এবং উসমানীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিল সুবিধাবাদের দ্বারা পরিচালিত। এ শক্তিগুলোর কোন একটি এককভাবে উসমানীয় সাম্রাজ্য দখল করতে সক্ষম ছিল না বলেই অপর কেউ তা দখল করতে এলে বাধার সৃষ্টি করত। এভাবে এ শক্তিগুলো উসমানীয় সাম্রাজ্য দখলের পরিবর্তে অন্য কেউ যাতে দখল করতে না পারে সে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। উসমানীয় সাম্রাজ্য নিয়ে বৈরী শক্তির এ সংঘাত তাদেরকে ভক্ষকের পরিবর্তে রক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ করে, যা পতনোন্মুখ এ সাম্রাজ্যকে দীর্ঘকাল টিকে থাকতে সাহায্য করে।

ইয়ামানের অবস্থা : আশ্ শাওকানীর সমকালে ইয়ামান রাজনৈতিকভাবে উসমানীয় খিলাফাতের অধীন ছিল এবং এর পররাষ্ট্রনীতিও নিয়ন্ত্রিত হতো উসমানীয়দের দ্বারাই। সে সময়ে তুর্কী কর্তৃক ইয়ামানের গভর্ণর নিযুক্ত হতো। তবে হিজরী তৃতীয় শতকের মধ্যভাগ থেকে চলে আসা ইমামাতের ব্যবস্থাপনা অব্যাহত ছিল। এখানে বংশগতভাবেই নেতৃত্ব নিযুক্তির ব্যবস্থা ছিল। শাসক গোষ্ঠী ছিল যায়দিয়া মাযহাবের অনুসারী।

---

৯. ইয়াহইয়া আরমাজানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬।

১০. প্রাগুক্ত।

১১. প্রাগুক্ত।

ইয়ামানবাসী তাদেরকে ইমাম বলত এবং তাদের হাতে খিলাফাতের বাইয়'াত গ্রহণ করত।[১২]

উসমানীয় সুলতান সুলাইমান ইবন সেলিমের শাসনামলে (১৫২০-১৫৬৬ খ্রি.) ইয়ামান উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ সময় ইয়ামানের শাসক ও ইমাম ছিলেন সাইয়্যিদ আল্ মুতাহ্হার ইবন ইমাম শারফুদ্দীন (মৃতঃ ৯৮০হি.)। সুলতান সুলাইমান ইবন সেলিমের নির্দেশে তুর্কী গভর্ণর সুলাইমান পাশা ৯১৫ হিজরীতে ইয়ামান আক্রমণ করেন এবং উপর্যুপরি হামলা করে প্রায় সমগ্র ইয়ামান দখল করে উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তবে তুর্কীগণ ইয়ামানে ইমামাতের ব্যবস্থাপনা অব্যাহত রাখে এবং এক ধরনের অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্ব শাসন দান করে।[১৩] সে সময়ের শাসকগোষ্ঠী যায়দিয়া মাযহাবের হলেও প্রজাসাধারণের অধিকাংশই ছিল সুন্নী, যারা শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিল।[১৪]

ইয়ামানের অধিকাংশ এলাকা উসমানীয়দের শাসনাধীনে আসলেও যায়দিয়া শাসনাধীন অংশটি নিয়ে উসমানীয় ও যায়দিয়াদের মধ্যে দীর্ঘ সময় দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলে। ফলে হিজরী দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী জুড়ে ইয়ামানে অস্থির ও অশান্ত পরিবেশ বিরাজিত ছিল। অবশেষে ১৩৩৫ হিজরীতে ইমাম ইয়াহইয়া ইবন মুহাম্মদ হামীদ উদ্দীনের সময় এ দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। বহু শক্তি ক্ষয় হওয়ার পর উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়।[১৫] কিন্তু দু:খের বিষয় হলো উসমানীয়রা যখন ইয়ামান পরিত্যাগের চিন্তা করে, তখন আদন প্রদেশটি বৃটিশদের নিকট সমর্পণ করে। এ সুযোগে স্বল্প সময়ের মধ্যেই বৃটেন পুরা অঞ্চলের উপর দখলদারিত্ব ও পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।[১৬]

অত:পর ইয়ামানে অভ্যন্তরীণ কোন্দল সূচিত হয়। তাদের দলাদলি, কোন্দল ও মতপার্থক্যের কারণে ইয়ামান উত্তর ইয়ামান ও দক্ষিণ ইয়ামান - এ দু'ভাগে বিভক্ত হয়। আশ্ শাওকানীর সময় ইয়ামানের সাথে মক্কা ও তিহামার সুপ্রতিবেশীসুলভ সুন্দর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।[১৭]

মুসলিমদের শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার অবস্থা : শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশিকার কারণেই সর্বাবস্থায় জ্ঞান শিক্ষাকে মুসলিমগণ আবশ্যক মনে করেছে। এ কারণেই রাজনৈতিক হট্টগোল, যুদ্ধ-বিগ্রহ, সাম্রাজ্যের পতন, শাসকদের স্বেচ্ছাচারিতা, জুলূম-নিপীড়ন প্রভৃতি কোন কিছুই জ্ঞান চর্চা থেকে মুসলিমদেরকে বিরত রাখতে

---

১২. সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৫।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ.২৫; আশ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর (মিশর : দারুল ওয়াফা, ৩য় সংস্করণ ২০০৫ ইং) খ. ১, পৃ. ৭।

১৪. সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

১৫. আশ্ শাওকানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

১৬. প্রাগুক্ত।

১৭. প্রাগুক্ত।

পারেনি। ফলে এ সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বড় বড় ইসলামী মনীষী ও পন্ডিত ব্যক্তি তৈরী হয়েছে।

হিজরী সপ্তম শতকের শেষ দিকে তাতারদের আক্রমণে বাগদাদের পতন ও ধবংসযজ্ঞ এবং শতাব্দীকাল থেকে জ্ঞান ও শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে গণ্য বাগদাদের সুপ্রাচীন ও বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ লাইব্রেরী জ্বালিয়ে ধ্বংস করার পরও অষ্টম শতকের শুরুতেই শায়খুল ইসলাম তাকিউদ্দীন ইবন দাকীক আল 'ঈদ (মৃতঃ ৭০২ হি.) এর মত মুহাদ্দিছ, 'আল্লামা 'আলাউদ্দীন আল রাজী (মৃত : ৭১৪ হি.) এর মত উসূল ও কালাম শাস্ত্রবিদ, শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়ার (মৃতঃ ৭২৮) এর মত গবেষক, চিন্ত াবিদ ও সংস্কারক, 'আল্লামা শামসুদ্দীন আয্ যাহাবী (মৃতঃ ৭৪৮ হি.) এর মত মুহাদ্দিছ ও ইতিহাসবিদ এবং 'আল্লামা আবু হায়্যান (মৃত : ৭৪৫ হি.) এর মত ভাষা ও ব্যাকরণবিদ প্রমুখ বড় বড় জ্ঞানী ব্যক্তিগণের সন্ধান পাওয়া যায়।[১৮]

বহিশত্রুর আক্রমণ এবং অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত সত্ত্বেও দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মিশর, শাম, ইরাক, হিজায, ইয়ামান, ইরান, ভারতবর্ষ প্রভৃতি সকল স্থানেই বিদ্যা চর্চা ছিল উল্লেখযোগ্য। মুসলিম বিদ্যান ও মাশায়িখগণ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা, আত্মশুদ্ধি, অভ্যন্তরীণ সংশোধন ও উন্নতি, আত্মিক পূর্ণতা প্রভৃতির জন্য সচেষ্ট ছিলেন।[১৯]

এ সময় ভারতবর্ষে প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ 'আল্লামা আবুল হাসান সিন্ধী (মৃতঃ ১১৩৮ হি.) (যিনি দীর্ঘদিন হারাম শরীফে হাদীছের দারস দিয়েছেন এবং আল হাওয়ামিশে ছিত্তা নামক সিহাহ্ সিত্তার প্রসিদ্ধ টীকা লিখেছেন) এবং মাওলানা

মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী (মৃতঃ ১১৬৩ হি.) এর মত বিজ্ঞ ব্যক্তি এবং শামে শায়খ ইসমা'ঈল আল্ আজনুয়ামী আল জারাহী (মৃতঃ ১১৬২ হি.) এর মত বড় মাপের মুহাদ্দিছ মনীষীগণকে দেখতে পাওয়া যায়।

সে সময়ের হাদীছ শিক্ষার বড় কেন্দ্র ছিল হারামাইন শরীফাইন, যেখানে আবু তাহির আল কারযানী আল কারাদী এবং শায়খ হাসান আল উজাইমী হাদীছের দারস দিতেন।

মিশরে 'আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দুল বাকী আয্যুরকালী (মৃতঃ ১১২২ হি.) হাদীছ শাস্ত্রে অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ফিলিস্তিনের শায়খ 'আব্দুল গনী আন্ নাবলুসী (মৃতঃ ১১৪৩ হি.) ছিলেন জ্ঞানের এক সমুদ্র বিশেষ। শিক্ষাদান, গ্রন্থ রচনা ও শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য তাঁকে আল উসদাজুল আ'জম উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

---

১৮. সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

এ সময়ে বাগদাদের 'আলিমদের মধ্যে 'আব্দুল্লাহ ইবন হুসাইন আস্ সুয়াইদী উল্লেখযোগ্য ছিলেন।[২০]

জ্ঞান চর্চায় ইয়ামান

নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগ থেকেই ইয়ামান জ্ঞান চর্চায় উল্লেখযোগ্য ছিল। একটি হাদীছ থেকেও এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণিত হাদীছটিতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন,

اتاكم اهل اليمن هم اضعف قلوبا و ارق افئدة الايمان يمان و الحكمة يمانية

"তোমাদের নিকট ইয়ামানবাসীরা আসছে। তারা দুর্বল চিত্তের ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী। ঈমান হলো ইয়ামানী এবং হিকমাতও (জ্ঞান বিজ্ঞান) হলো ইয়ামানী।"[২১]

দ্বীনের সঠিক বুঝ এবং কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা গ্রহণের জন্য ইয়ামানবাসীগণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আগমণ করত এবং দেশে ফিরে গিয়ে লোকদেরকে তা শিক্ষা দিত। এভাবে ইয়ামান হাদীছ শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু এবং দ্বীনী বিষয়াবলী অনুধাবন ও বুঝার এক বিরাট শিক্ষাগারে পরিণত হয়। বহির্বিশ্বের বহু লোক শিক্ষালাভের জন্য ইয়ামান আগমন করেন, যাদের মধ্যে ছিলেন মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস আশ্ শাফি'ঈ, আহমাদ ইবন হাম্বল, ইবনুল মুবারক, ইবনুল মু'ঈন, মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া আন্ নিসাবুরী এবং ইসহাক ইবন রাহওয়াই প্রমুখ।[২২]

হিজরী দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে ইয়ামান জ্ঞান চর্চার এক বৃহৎ কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানে হিজরী দ্বাদশ শতকে 'সুবুলুস্ সালাম' গ্রন্থের প্রণেতা মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল (মৃত: ১১৪২ হি.) এবং ত্রয়োদশ শতকে 'নাইলুল আওতার' গ্রন্থের লেখক মুহাম্মাদ ইবন 'আলী আশ্ শাওকানী (১১৭৩-১২৫০ হি.) জন্মগ্রহণ করেন।[২৩]

ইয়ামানে সে সময় সুলাইমান ইবন ইয়াহইয়া আল্ আহদাল (মৃত: ১১৯৭ হি.) এর মত বিজ্ঞ মুহাদ্দিছ ও হাদীছ প্রচারক, মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আস্ সাফরিনী (মৃত: ১১৮৮ হি.) এর মত হাদীছ ও উসূলবিদ, আল আমীর মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আস্ সান'আনী (মৃত; ১১৪২ হি.) এর মত বড় মুহাদ্দিছ ও গবেষক এবং 'আল্লামা মুহাম্মাদ সা'ঈদ আস্ সাম্মুল (মৃত; ১১৭৫ হি.) এর মত বিজ্ঞ পন্ডিতের নাম নজরে আসে।[২৪]

---

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৩।

২১. আবু 'ঈসা মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা, জামি' আত্ তিরমিযি, খ. ২, আবওয়াবুল মানাকিব, ফি ফাজলিল ইয়ামান।

২২. আশ্ শাওকানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

২৩. সায়্যেদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

এ সময়ে মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক সুদৃঢ় কাঠামোর উপর **প্রতিষ্ঠিত** ছিল। মিশরে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, তিউনিসে আয্ যাইতুনা **বিশ্ববিদ্যালয়,** মরক্কোর ফাস নগরীতে আল কারবীন বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানের আলো **বিশ্বময় ছড়িয়ে** দিচ্ছিল। এতদ্ব্যতীত দামেশকে মাদরাসাতু হাফিজিয়া, আল মাদরাসাতুশ্ শাল্মিয়া এবং আল মাদরাসাতুল আযরাবিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।[২৫]

কুরআন, হাদীছ এবং ফিকহ্ এর ব্যাপক চর্চা ছাড়াও সাহিত্য ও কাব্য চর্চায় লোকদের ঝোঁক ছিল প্রবল। ছন্দপ্রকরণ ও অনুপ্রাসযুক্ত কথামালা রচনার ব্যাপক অনুশীলন ছিল। জ্ঞান চর্চার আসরের প্রচলন ছিল ব্যাপক। যুক্তিবিদ্যা, হিসাবশাস্ত্র, জ্যামিতি ও প্রকৌশল বিদ্যা, অলংকারশাস্ত্র প্রভৃতির শিখন ও শিক্ষাদান ছিল সাধারণভাবে প্রচলিত। সে সময়ের লোকেরা বিদ্যা শিক্ষার জন্য উসমানীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী ইস্তাম্বুলেও গমন করত।[২৬]

সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা : শিক্ষার চর্চা, হাদীছ থেকে রসদ সংগ্রহ, কামিল ব্যক্তিবর্গের বিদ্যমান থাকা, অনেক দ্বীনদার মুসলিম শাসকের বর্তমান থাকা, ইসলামী 'আকীদা, কর্ম জীবনের বহু শাখা এবং পারিবারিক বিধিবিধান শারী'আতের উপর থাকা, মাদরাসা ও মসজিদসমূহ আবাদ থাকা, সাধারণ জনগণ ইসলাম প্রিয় হওয়া , জনগণ 'উলামা মাশায়িখগণের সম্মানদানকারী ও

অনুসারী হওয়া, দ্বীনের আরকান ও ফরজসমূহ প্রতিপালন এবং তাদের অন্ত:করণ ইসলামের অনুপ্রেরণায় উদ্বীপ্ত থাকা সত্ত্বেও সাধারণভাবে ইসলামের মধ্যে স্থবিরতা ও অধ:গতি লক্ষ্য করা যায়। মানুষের চরিত্র ও সমাজ জীবনে বিকৃতি এবং মুসলিমদেরকে বিজাতীয় ও বিধর্মীদের ধর্মীয় প্রতীক ও আচার-আচরণ গ্রহণ করা প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। শাসকদের স্বেচ্ছাচারিতা ও সাম্রাজ্যে নিয়ন্ত্রণহীনতা ছিল লক্ষণীয়। নেতৃস্থানীয় ও ধনিক শ্রেণী ক্ষমতা ও সম্পদের মোহে আচ্ছন্ন ছিল এবং বিলাসিতা ও ভোগ-সম্ভোগে বিভোর ছিল। সমাজের বিভিন্ন স্তরে অলসতা ও জড়তা জেঁকে বসেছিল। সুবিধাবাদী ও তোশামোদী স্বভাব প্রবল আকার ধারন করেছিল।

সভা সমাবেশ ও ধর্মীয় আসরে অলীক ও কল্পিত বিষয়াদির প্রাবল্য, খাঁটি তাওহীদের সীমালংঘন, ওলিদের প্রতি অতি পবিত্র ধারণা করা ও তাদের প্রতি সীমাতিরিক্ত ভক্তি-সম্মান, কবর পূজা, কোথাও কোথাও সুস্পষ্ট শিরকে লিপ্ত হওয়া প্রভৃতি সে সময়ে ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়।[২৭]

---

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪।
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮-৩৯।

সাইয়্যেদ আবুল হাসান 'আলী নদভী তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'তারিখে দাও'য়াত ওয়া আযীমত এ আমেরিকার লেখক ড. লুথ্রপ স্টুডার্ড এর ঘবা ড়িৎষফ ড়ভ ওংষধস নামক গ্রন্থ হতে খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর ইসলামী দুনিয়ার যে চিত্র তুলে ধরেছেন, তা থেকে সে সময়ের মুসলিমদের অবস্থা আঁচ করা যায়। তিনি লিখেছেন, "অষ্টাদম শতাব্দীতে ইসলামী বিশ্ব দুর্বলতার চরম সীমায় উপনীত হয়। যথাযথ শক্তির প্রভাব কোথাও পরিলক্ষিত হয়না। প্রতিটি স্থানে স্থবিরতা ও অধঃগতি সূচিত হয়। আদব-কায়দা ও স্বভাব চরিত্র ছিল অধঃপতিত। আরবী সভ্যতার শেষ চিহ্নটুকুও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। লোকেরা পাশবিক লাঞ্ছনার মধ্যে জীবন যাপন করত। শিক্ষা-দীক্ষা মৃত হয়ে গিয়েছিল এবং কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলেও তা আশংকাজনকভাবে পতনোন্মুখ অবস্থায় ছিল। তারা অতি দারিদ্রের মধ্যে জীবন যাপন করত। সাম্রাজ্য ছিল নিয়ন্ত্রণহীন এবং তাতে অপশাসন ও রক্তপাতের সয়লাব ছিল। কোন কোন স্থানে কোন কোন স্বাধীন সুলতান- যেমন তুর্কী ও ভারতের মোগল সম্রাট কিছুটা শাহী শান বজায় রেখেছিল, কিন্তু প্রাদেশিক শাসকগণ তাদের সম্রাটদের মতই জুলুম এবং জবরদস্তিমূলক স্বাধীন সাম্রাজ্য কায়েমের চেষ্টারত ছিল। তেমনিভাবে শাসকগণ অবিরাম বিদ্রোহ, স্থানীয় নেতা ও ডাকাতদল, যারা সাম্রাজ্যের ক্ষতি করত- তাদের বিরুদ্ধে লেগে থাকতে বাধ্য হতো। এ ধরনের বিশৃংখল সাম্রাজ্যে প্রজাগণ লুটতরাজ ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিল। শহর ও গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল ছিল। ফলে ব্যবসা ও কৃষি এতটাই হ্রাস পেয়েছিল যে, জীবন ধারনই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছিল।"[২৮]

ড. লুথ্রপ স্টুডার্ডের বর্ণনায় কিছুটা অতিরঞ্জন থাকলেও সে সময়ের মুসলিম বিশ্বের সামাজিক অবস্থার চিত্র মোটামুটি এমনটিই ছিল।

অন্যান্য অবস্থার মত ধর্মীয় অবস্থাও ছিল অত্যন্ত নাজুক। বিকৃত তাসাউফের শিশুসুলভ অলীক কল্পনার প্রাবল্য খাঁটি ইসলামী তাওহীদকে ঢেকে ফেলেছিল। সাধারণ ও মূর্খ শ্রেণী তা'বীজ-কবয ব্যবহার ও গলায় মালা ঝুলানোয় ব্যাপকভাবে অভ্যস্ত হয়ে পরেছিল। ভন্ড পীর-ফকির ও পাগল-দরবেশদের উপর আস্থা স্থাপন করত এবং বুযর্গদের কবর যিয়ারত করতে যেত। আল্লাহর দরবারে সুপারিশকারী ও ওলী হিসেবে তাদের পূজা করত। কারণ এ সকল মূর্খদের ধারণা ছিল, আল্লাহ্ এত বড় যে, কোন প্রকার মাধ্যম ছাড়া তাঁর আনুগত্য করতে তারা সক্ষম নয়। কুরআনের বাস্তব শিক্ষাকে তারা শুধু পশ্চাতে ছুড়ে ফেলেই ক্ষান্ত হয়নি, অধিকন্ত তার বিপরীত কর্মকান্ডে ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। আফিম ও শরাব সেবন এবং ব্যভিচার ব্যাপকতা লাভ করেছিল এবং নিকৃষ্টতম খারাপ কাজসমূহ নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্যেই করা হতো।[২৯]

---

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০।
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪১।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাম ও বংশ পরিচয়

নাম : তাঁর নাম মুহাম্মাদ, পিতার নাম 'আলী,[৩০] মাতার নাম উম্মুল ফজল বিনতে আবিল হাসান 'আলী ইবন ইসহাক ইবন 'আলী ইবন মুহাম্মাদ আল মালিকী আশ্ শাওকানী এবং দাদার নাম মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দুল্লাহ ইবনুল হাসান।[৩১] তাঁর উপনাম ছিল আবু 'আব্দিল্লাহ এবং উপাধি ছিল শায়খুল ইসলাম।[৩২]

আশ্ শাওকানী : মুহাম্মাদ ইবন 'আলী সাধারণ্যে আশ্ শাওকানী নামেই সমধিক পরিচিত। বিশেষতঃ তাফসীর জগতে তাঁর এ নামই প্রসিদ্ধ। শাওকান নামক স্থানের সাথে সম্পর্কিত করেই তাঁকে আশ্ শাওকানী বলা হয়।

শাওকান : সান'আ থেকে এক দিনের পথের দূরত্বে অবস্থিত ইয়ামানের একটি অঞ্চলের নাম শাওকান। এটি খাওলানের একটি গোত্র সুহামিয়াদের গ্রাম। কামুস অভিধান গ্রন্থে এটিকে বাহরাইনের একটি অঞ্চল, ইয়ামানের একটি দুর্গ এবং সারাখ্স ও আবিওয়ার্দের মধ্যবর্তী এক শহর বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৩] মারসাদ নামক গ্রন্থে একে জিমারের

---

৩০. 'আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবনুল হুসাইন ১১৩০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১২১১ হিজরীর জিলকা'আদ মাসের ১৪ তারিখ রবিবার 'ইশার আযানের পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর দুই পুত্র ছিল। তাঁরা হলেন মুহাম্মাদ (১১৭৩ - ১২৫০ হি.) এবং ইয়াহইয়া (১১৯০-১২৬৭ হি.) মুহাম্মাদ ইবন 'আলী আশ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর আল জামি' বাইনা ফান্নায়িদ্ দিরায়াঃ ওয়ার রিয়ায়াঃ মিন 'ইলমিত তাফসীর (কায়রোঃ দারুল হাদীছ, তা.বি.) খ. ২, পৃ. ২২; আশ শাওকানী, আল্ বাদরুত্ তালি' বিমুহাসিনি মিম বা'দি কারনিস সাবি' (বৈরূত : দারুল মা'রিফা, তা.বি) খ. ১, পৃ. ৪৭৯-৪৮০; জালাল উদ্দীন, 'আল্লামা শাওকানী 'আবকারিয়্যাতুহু ওয়া মানহাজাহু ফি তাফসীরিহি (এম.ফিল গবেষণাপত্র, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ২০০২ খৃ.) পৃ. ৭।

৩১. The Encyclopaedia of Islam (New Edition, Leiden, 1997) vol. 9, p. 378; আশ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর প্রাগুক্ত ; জালাল উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

৩২. আশ্ শাওকানী, নাইলুল আওতার শারহি মুন্তাকাল আখবার (বৈরূত : দারুল ফিক্র , ২য় সংস্করণ, ১৪০৩ হি. ১৮৮৩ খ্রি.) খ. ১, ভূমিকা , পৃ.ي ; জালাল উদ্দীন, প্রাগুক্ত। এতদ্ব্যতীত তার আরো অনেকগুলো উপাধি রয়েছে। সেগুলো হলো : বাদরুদ্দীন, ইমামুল আয়িম্মা, মুফতিউল উম্মাহ, বাহরুল 'উলুম, 'আল্লামাতুয যামান, কাজিউল কুজাত। আশ্ শাওকানী, নাইলুল আওতার, প্রাগুক্ত, পৃ. ي-ك; জালাল উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

৩৩. আশ্ শাওকানী, আল্ বাদরুত তালি', খ. ১, পৃ. ৪৮০।

পার্শ্বে ইয়ামানের একটি গ্রাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যা সান'আ থেকে দুই মারহাল (দুই দিনের পথের) দূরত্বে অবস্থিত।[৩৪]

আবু সা'আদ বলেন, সারাখস এবং আবিওয়ার্দের মধ্যবর্তী খাবিরান নামক স্থানের পার্শ্ববর্তী শহরের নাম শাওকান। এর সাথে 'আতীক ইবর মুহাম্মাদ ইবন আনবাস আবুল ওয়াফা আশ্ শাওকানী সম্পর্কিত।[৩৫]

কারো কারো মতে শাওকানীর জন্মস্থান শাওকানের অদূরবর্তী এক দীর্ঘ পাহাড়ী অঞ্চলে, যার নাম 'আল হিজরা:' বা 'হিজরাতুশ শাওকান'।[৩৬]

এই শাওকান বা হিজরাতুশ শাওকানে তাঁর বংশধরগণ বাস করতো বলে তাদেরকে আশ্ শাওকানী বলা হয়।[৩৭]

ইয়ামান, সান'আ এবং খাওলানের সাথে সম্পর্কিত করে তাকে ইয়ামানী, সান'আনী এবং খাওলানীও বলা হয়।[৩৮]

জন্ম তারিখ : ১১৭৩ হিজরী, ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ, জিলকা'আদ মাসের ২৮ তারিখ সোমবার মধ্যাহ্নে মুহাম্মাদ ইবন 'আলী আশ্ শাওকানী জন্মগ্রহণ করেন।[৩৯]

---

৩৪. আশ্ শাওকানী, প্রাগুক্ত; আশ্ শাওকানী, নাইলুল আওতার, খ. ১, ভূমিকা , পৃ. ঐ ; জালাল উদ্দীন, প্রাগুক্ত; শিহাবুদ্দীন আবু 'আব্দিল্লাহ ইয়াকুত ইবন 'আব্দিল্লাহ, মু'জামুল বুলদান (বৈরুত : দারু সাদির, তা.বি) খ. ৩, পৃ ৩৭৩।

৩৫. ইয়াকুত, প্রাগুক্ত; আবু সা'আদ 'আব্দুল করীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন মানসুর আত্ তামীমী আস্ সান'আনী, আল আনসাব (বৈরুত : দারুল জানান ১ সং, ১৪০৮ হি. ১৯৮৮ খ্রি.) খ. ৩, পৃ. ৪৭০

৩৬. আশ্ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, প্রাগুক্ত, আশ্ শাওকানী, নাইলুল আওতার, প্রাগুক্ত, জালাল উদ্দীন, প্রাগুক্ত; ড. মুহাম্মাদ হুসাইন আয যাহাবী, আত্ তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরুন (কায়রো : দারুল হাদীছ, ২০০৫ খ্রি.) খ. ২, পৃ. ২৪৯। বাহরাইনের একটি স্থানের নামও শওকান। তবে ইয়ামানে যে শওকান অবস্থিত সেটিই 'আল্লামা শাওকানীর জন্মস্থান। (আবু সা'আদ, প্রাগুক্ত)

৩৭. জালাল উদ্দীন, প্রাগুক্ত; আশ্ শাওকানী, নাইলুল আওতার, প্রাগুক্ত।

৩৮. আশ্ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, প্রাগুক্ত; জালাল উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

৩৯. আশ্ শাওকানী, প্রাগুক্ত; The Encyclopaedia of Islam (New Edition, Leiden, 1997) vol. 9, p. 378; আয্ যাহাবী, প্রাগুক্ত। আশ্ শাওকানীর জন্ম সনের ব্যাপারে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। নাইলুল আওতারের ভূমিকায় এবং জালাল উদ্দীনের গবেষণা পত্রে তাঁর জন্ম সন ১১৭২ হি. উল্লেখ করা হয়েছে। (আশ্ শাওকানী, নাইলুল আওতার খ. ১, ভূমিকা, পৃ. ঐ; জালাল উদ্দীন, আল্লামা আশ্ শাওকানী 'আবকারিয়্যাতুহু ওয়া মানহাজুহু ফিত্ তাফসীর, পৃ. ১২) আবজাদুল 'উলূম নামক গ্রন্থে তাঁর জন্ম সন ১১৭৭ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (জালাল উদ্দীন, প্রাগুক্ত) 'আল্লামা আশ্ শাওকানী ফাতহুল কাদীরের ভূমিকায় এবং 'আল্লামা আয্ যাহাবী আত্ তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরুন গ্রন্থে ১১৭৩ হিজরীকেই তাঁর জন্ম সন বলে উল্লেখ করেছেন। এ মতটিই সঠিক। কারণ 'আল্লামা আশ্ শাওকানী আল বাদরুত তালি' নামক গ্রন্থে তাঁর পিতার লেখার উদ্ধৃতিতে তাঁর জন্ম সন ১১৭৩ হিজরী বলেই উল্লেখ করেছেন। (জালাল উদ্দীন, প্রাগুক্ত) জন্ম সনের ব্যাপারে মতভেদ থাকলেও ২৮ জুলকা'আদা সোমবারের ব্যাপারে কোন মতভেদ পরিলক্ষিত হয়না।

শৈশব ও কৈশোর : মুহাম্মাদ ইবন 'আলী আশ্ শাওকানী স্বীয় পরিবারে তাঁর পিতার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন। পিতা 'আলী তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ ও আদর যত্নে লালন পালন করেন। পিতার গৃহে তিনি আত্ম মর্যাদা ও রুচিবোধ সম্পন্ন একজন মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠেন।[৪০] তাঁর পিতা-মাতা উভয়ের পরিবারই ছিল সুশিক্ষিত। পারিবারিক প্রভাবেই তিনি পরবর্তী কালে স্বনাম ধন্য ও প্রতিভাধর একজন পন্ডিত, চিন্তাবিদ ও সুলেখক হিসেবে গড়ে উঠেন।

তাঁর পিতা : আশ্ শাওকানীর পিতা 'আলী ইবন মুহাম্মাদ একজন বড় 'আলিম ও বিচারক ছিলেন। এ প্রসঙ্গে কাজী মুহাম্মাদ 'আব্দুল হাকীম বলেন, و كان والده من كبار علماء صنعاء و قضاتها "তাঁর পিতা সান'আর একজন বড় মাপের বিজ্ঞ ব্যক্তি ও বিচারক ছিলেন।"[৪১] হিজরা বা হিজরাতুশ শাওকানেই তাঁর পিতা জন্ম গ্রহণ করেন ও বড় হন। তিনি প্রথমে কুরআন হিফ্য করেন। এরপর জ্ঞানান্বেষণের জন্য সান'আয় গমন করেন। সেখানে তিনি একদল বিজ্ঞ পন্ডিতের নিকট জ্ঞান চর্চা করেন।

তিনি ফিক্হ, উসূলে ফিক্হ, ফারায়িজ, হাদীছ, তাফসীর, নাহু প্রভৃতি শাস্ত্রে গভীর পান্ডিত্য অর্জন করেন।[৪২] তিনি জ্ঞানার্জনের জন্য পরিবার ও দেশ ছেড়ে দীর্ঘদিন সফরে থাকতেন।[৪৩] শিক্ষা জীবনের শেষের দিকে তিনি সান'আতে পাঠদান ও ফাতওয়া প্রদান শুরু করেন।[৪৪]

ইমাম মাহদী আল 'আব্বাস ইবনুল হুসাইন তাঁকে প্রথমে: সান'আর খাওলান প্রদেশের বিচারক নিযুক্ত করেন। কিন্তু তিনি এতে আপত্তি করায় পরবর্তীতে তাঁকে সান'আর বিচারক নিযুক্ত করা হয়। এখানেই তিনি সপরিবারে অবস্থান করেন।[৪৫] বিচার কার্যে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি জ্ঞান অন্বেষণ ও পাঠদান পরিত্যাগ করেননি; বরং তিনি বিভিন্ন মসজিদে ফিক্হ ও ফারায়িজ শিক্ষা দিতেন।[৪৬]

তাঁর মাতা : আশ্ শাওকানীর মাতা উম্মুল ফজলের গৃহও ছিল জ্ঞান চর্চার বিশেষত: হাদীছ চর্চার অন্যতম কেন্দ্র। উম্মুল ফজলের পিতা আবুল হাসান ছিলেন একজন বিজ্ঞ 'আলিম। তিনি বিদ্যার্জনের জন্য তৎকালীন জ্ঞান চর্চার অন্যতম কেন্দ্র নিশাপুরে গমন

---

৪০. আশ্ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, আশ্ শাওকানী, নাইলুল আওতার খ. ১, ভূমিকা, পৃ. ل; আয্ যাহাবী, আত্ তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরুন, খ. ২, পৃ. ২৪৯।
৪১. আশ্ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, খ. ১, পৃ. ২২।
৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৩।
৪৩. প্রাগুক্ত।
৪৪. প্রাগুক্ত।
৪৫. প্রাগুক্ত।
৪৬. প্রাগুক্ত।

করতেন এবং আবুল মুফরিজ আস সাম'আনীর পাঠ শ্রবণ করতেন। তাঁর উল্লেখিত শিক্ষকের অনুমতিক্রমে তিনি একদল বিজ্ঞ শিক্ষকের সান্নিধ্য লাভ ও তাঁদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জনের সুযোগ লাভ করেন, যাদের মধ্যে ছিলেন আবু মুহাম্মাদ 'আব্দুল হামীদ ইবন 'আব্দির রহমান আল বাহরী, আবু 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আলী ইবন মুহাম্মাদ আশ্ শাওকানী আল মালিকী।[৪৭]

পিতা-মাতার উভয় পরিবার সুশিক্ষিত হওয়ায় মুহাম্মাদ ইবন 'আলী আশ্ শাওকানী সুশিক্ষার পরিবেশেই লালিত-পালিত ও বড় হন। বিশেষ করে তাঁর পিতা একজন বড় 'আলিম ও বিচারক হওয়ায় পারিবারিক ঐতিহ্যের আলোকেই তিনি ইসলামের শিক্ষা, জীবন দর্শন, ব্যবস্থাপনা ও রাজনীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ এবং সচেতন হওয়ার সুযোগ পান, যার প্রভাব তাঁর পরবর্তী জীবনে লক্ষ্যণীয়।

শিক্ষাজীবন

ছোট বেলায় পরিবারেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। বিজ্ঞ পিতার তত্ত্বাবধানেই তিনি পড়া-লেখা শুরু করেন। তাঁর পিতা অত্যন্ত যত্নের সাথে ছেলের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন। তিনি তাঁকে সকল দিক থেকে মুক্ত করে শুধু পড়ালেখায় মনোনিবেশের ব্যবস্থা করেন। এ ব্যপারে আল্লামা আশ্ শাওকানী নিজেই বর্ণনা করেন, "আমার পিতা আমার সংগে অত্যন্ত সদাচার ও স্নেহপূর্ণ আচরণ করতেন এবং জ্ঞানার্জন ও তা ঠিক রাখার জন্য এমন সহাযোগিতা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন যে, জ্ঞানার্জন ছাড়া আমার আর কোন কাজই ছিলনা"।[৪৮]

পিতা ছোট বেলায় তাঁর পাঠদানের ব্যবস্থা করেন এবং সে জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। তিনি তাঁর এবং তাঁর ছোট ভাই ইয়াহ্ইয়ার জন্য শিক্ষার পথ প্রশস্ত করার সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।[৪৯]

'আল্লামা আশ্ শাওকানী ছোট বেলা হতেই পড়ালেখায় গভীর মনোনিবেশ করেন। তিনি পিতার সংস্পর্শে থেকে সে সময়ের বড় বড় আলিমের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তাঁদের নিকট হতে জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শ্রবণ করেন। ফলে বিদ্যার্জনের প্রতি তাঁর আগ্রহ এতটাই প্রবল হয় যে, তিনি জ্ঞানান্বেষণে একনিষ্ঠভাবে আত্মনিয়োগ করেন এবং কঠোর অধ্যবসায়ে লিপ্ত হন।[৫০]

---

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮০। জালাল উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।
৪৮. আশ্ শাওকানী, আল বাদরুত্ তালি', খ. ১, পৃ. ৪৮৪।
৪৯. আশ্ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর , খ. ১, পৃ. ২২।
৫০. আশ্ শাওকানী, নাইলুল আওতার খ. ১, পৃ. (ل); আয্ যাহাবী আত তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুল খ. ১, পৃ. ২৪৯।

বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন

বিদ্যার্জনের জন্য গভীর অধ্যবসায়ের ফলে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই জ্ঞানের প্রায় প্রতিটি শাখায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, উসূলে ফিকহ, সাহিত্য, ইতিহাস, নাহু, সরফ, অলংকার শাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, হিসাব বিজ্ঞান, তর্ক শাস্ত্র, ছন্দপ্রকরণ বিদ্যা, বিজ্ঞান, শরীর বিদ্যা, প্রকৃতি বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, পরিবেশ বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেন।[৫১]

আনুষ্ঠানিক পড়ালেখার শুরু থেকেই তিনি ইতিহাস অধ্যয়ন ও সাহিত্য সভায় যোগদানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। দিনের পর দিন তিনি লাইব্রেরীতে অবস্থান করে বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং অনেক আলোচনা সভায়ও অংশ গ্রহণ করেন। এর পর তিনি বিভিন্ন বিদ্বান ব্যক্তির নিকট হতে জ্ঞানার্জন করেন এবং তাঁদের মৌখিক বক্তব্য শ্রবণ ও গ্রহণ করতে শুরু করেন।[৫২] অধ্যয়ন, শ্রবণ, শিক্ষা সভায় অংশগ্রহণ প্রভৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করে স্বল্প সময়ে এমন পান্ডিত্য লাভ করেন যে, সেই সময় তিনি জ্ঞানের শীর্ষ আসনে আসীন হতে সক্ষম হন।

তিনি যায়দিয়া[৫৩] মাযহাবের উপর প্রচুর পড়ালেখা করেন। এ মাযহাবের তিনি এক জন বিজ্ঞ সমঝদার ছিলেন এবং এ মাযহাবের উপর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, লেখেন ও ফাতওয়া দান করেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি মাযহাবী তাকলীদ বা অন্ধ অনুকরণ পরিত্যাগ করে ইজতিহাদে মনোনিবেশ করেন এবং এ বিষয়ে তিনি "আল কাওলুল মুফীদ ফি আদিল্লাতিল ইজতিহাদ ওয়াত্ তাকলীদ" নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

---

৫১. জালাল উদ্দিন প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮। (আল বাদরুত তালিল', খ. ২, পৃ ২১৯ এর উদ্ধৃতিতে)

৫২. আশ্ শাওকানী, নাইলুল আওতার, প্রাগুক্ত; জালাল উদ্দিন প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৭।

৫৩. যায়দিয়া শিয়াদের একটি উপদল। তাদের ইমাম হলেন যায়িদ ইবন 'আলী। শিয়াদের অন্যান্য উপদলের তুলনায় যায়দিয়া সম্প্রদায়ের সংগে আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পার্থক্য অপেক্ষাকৃত কম। য়ায়দিয়ারা মনে করেন 'আলী (রা) সকল সাহাবীর চেয়ে উত্তম এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পর খিলাফাতের অধিকতর যোগ্য । তারা বলেন, ফাতেমী বংশের যে কোন ব্যক্তি যদি 'আলিম, দুনিয়া বিমুখ, সাহসী ও বদান্যতার অধিকারী হয়, তাহলে এমন ব্যক্তি ইমামতের (খিলাফাতের) জন্য বের হলে তার ইমামত শুদ্ধ হবে এবং তাঁর আনুগত্য করা ওয়াজিব হবে, চাই সে হাসানের বংশধর হোক অথবা হোসেনের বংশধর । তবে এতদসত্ত্বেও তাঁরা আবু বাকর এবং উমার (রা) এর খিলাফাতকে অমান্য করেন না এবং তাঁদেরকে কাফিরও আখ্যা দেন না। বরং তাদের খিলাফাতকে তারা বৈধ মনে করেন। কারণ তাঁদের মতে উত্তম ব্যক্তির বর্তমানে অপেক্ষাকৃত কম উত্তম ব্যক্তির ইমামত বৈধ। তারা ইমামদের নিষ্পাপ হওয়ার প্রবক্তা নন। তবে তাঁরা ইমামদের জন্য ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়ার শর্তারোপ করেন । যায়দিয়ারা আহলি বায়তের বর্ণিত হাদীস ব্যতীত অন্যান্য সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে নির্ভরযোগ্য মনে করে না।
যায়দিয়া সম্প্রদায় মুতাযিলাদের চিন্তা ও 'আকীদার দ্বারা বেশ প্রভাবিত । এর কারণ তাদের ইমাম যায়িদ ইবন 'আলী মুতাযিলা সম্প্রদায়ের ইমাম ওয়াসিল ইবন 'আতার ছাত্র ছিলেন। (আয্ যাহাবী, আত তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন, খ. ২, পৃ. ২৪৫।

তাকলীদ বর্জন করে ইজতিহাদের প্রতি মনোনিবেশ করায় একদল 'আলিম তাঁর উপর চড়াও হয় এবং তাঁর প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করে। তাঁর ইজতিহাদের কারণে ইয়ামানের সান'আতে মুকাল্লিদ ও মুজতাহিদ-এ দু'দলের মধ্যে দ্বন্দ্বের সূচনা হয়।[৫৪]

আশ্ শাওকানীর জ্ঞান এতটাই পরিপক্ক ও তাঁর ধীশক্তি এতটাই প্রখর ছিল যে, অল্প বয়সেই তিনি ইজতিহাদের (চিন্তা-গবেষণার) যোগ্যতা অর্জন করেন। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ আব্দুল হাকীম কাজী বলেন , "তিনি তাকলীদ প্ররিত্যাগ করে 'ইলমে ইজতিহাদ বা গবেষণা বিদ্যায় নজর দেন, এমনকি এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেন। অত:পর ত্রিশ বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পূর্বেই তিনি ইজতিহাদ করা শুরু করেন।"[৫৫]

বিভিন্ন গ্রন্থ মুখস্থ করণ

আল্লামা আশ্ শাওকানী প্রখর স্মরণ শক্তির অধকারী ছিলেন। দ্রুততম সময়ে তিনি পঠিত বিষয় মুখস্থ করতে পারতেন। ছোট বেলা থেকেই তার স্মৃতি শক্তি ছিল অতুলনীয়। প্রখর ধীশক্তি, ক্ষিপ্র বোধশক্তি, মজবুত ধারন ক্ষমতা এবং অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার ফলে তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিভিন্ন বিষয়ের অনেক গ্রন্থ মুখস্থ করে ফেলেন। তাঁর মুখস্থকৃত যে সকল গ্রন্থাবলীর সন্ধান পাাওয়া যায়, সেগুলোর বর্ণনা নিন্মে প্রদত্ত হলো:

১. কুরআনুল কারীম : ছোট বেলাতেই তিনি তাজবীদসহ কুরআন শিক্ষা করেন এবং তা মুখস্থ করেন। তিনি সান'আর কিরায়াত বিশেষজ্ঞ শায়খদেরকে কুরআন পাঠ করে শুনান।
২. কিতাবুল আযহার : এটি ইমাম মাহ্দী রচিত যায়দিয়া মাযহাবের ফিকহ্ গ্রন্থ।
৩. মুখতাসারুল ফারায়িজ : এটি 'উসাইফিরি এর লেখা ফারায়িজ শাস্ত্রের একটি গ্রন্থ।
৪. মুলাহ্হাতুল ই'রাব লিল হারীরী।
৫. আল কাফিয়া। (নাহু শাস্ত্র)
৬. মুখতাসারুল মুনতাহা (উসূলে ফিকহের গ্রন্থ)
৭. আশ্ শাফিয়া ('ইলমে সরফ)। এ গ্রন্থ চারটির রচয়িতা 'আল্লামা ইবনুল হাযিব।
৮. আত্ তাহযীব। এর লেখক 'আল্লামা তাফতাযানী।
৯. আত্ তালখীস। এটি আল্লামা কাজবীনীর লেখা অলংকার শাস্ত্রের একটি গ্রন্থ।
১০. আল গায়াহ। ইবনুল ইমাম এর লেখক।
১১. মানজুমাহ। আল জাযরীর লিখা ইলমে কিরায়াতের কিতাব।
১২. মানজুমাহ। আল জাযরীর লিখা ছন্দ প্রকরণের গ্রন্থ।

---

৫৪. প্রাগুক্ত।
৫৫. আশ্ 'শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, খ. ১. পৃ. ২২।

১৩. আদাবুল বাহাছ ওয়াল মুনাযারা।

১৪. রিসালাতুল ওয়াজা'। এ গ্রন্থ দুটি ইমাম আজ্‌দ কর্তৃক প্রণীত ।[৫৬]

এ সকল কিতাব মুখস্থ করা থেকেই 'আল্লামা আশ্‌ শাওকানীর মেধা ও স্মরণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যে প্রখর ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তীক্ষ্ম মেধা ও স্মরণশক্তির বলেই তিনি অল্প সময়ে অনেক বিষয় আয়ত্ত করতে সক্ষম হন। এক সাথে বহু বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জনের মূলেও ছিল তাঁর স্মরণশক্তি।

বিভিন্ন শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন

উল্লেখিত গ্রন্থসমূহ মুখস্থ করার পর আল্লামা আশ্‌ শাওকানী সান'আর বিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট বিভিন্ন কিতাব পাঠ করেন। বিষয় ভিত্তিক ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য তদানিন্তন যুগের বড় বড় পন্ডিতদের নিকট সংশ্লিষ্ট বিষয় অধ্যয়ন করেন।। কোন্‌ শিক্ষকের নিকট তিনি কোন্‌ কোন্‌ কিতাব অধ্যয়ন করেন বিভিন্ন গ্রন্থে তারও বিবরণ পাওয়া যায়। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো-

১. পিতা 'আলী ইবন মুহাম্মাদ ঃ ছোট বেলায় তাঁর প্রথম শিক্ষক ছিলেন পিতা 'আলী ইবন মুহাম্মাদ। তাঁর নিকট তিনি শরহুল আযহার ও মুখতাসারুল উসাইফিরি শরাহ শারহুন নাজিরী পাঠ করেন। এতদ্‌ব্যতীত তাঁর পিতা তাঁকে সহীহ আল বুখারীর পাঠদান করেন।[৫৭]

২. আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল হারাযী ঃ এ শিক্ষকের নিকট তিনি ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এছাড়া শরহুল আযহার, শরহুন নাজিরী বায়ানু ইবনুল মুজফির প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করেন। এ শিক্ষকের নিকট তিনি দীর্ঘ ১৩ বছর শিক্ষা গ্রহণ করেন।[৫৮]

৩. ইসমা'ঈল ইবনুল হাসান ঃ এ শিক্ষকের নিকট তিনি আরবী সাহিত্য ও নাহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। আল মুলাহ্‌হা গ্রন্থটি তিনি তাঁকে পাঠ করে শুনান।[৫৯]

৪. 'আব্দুল্লাহ ইবন ইসমা'ঈল আল নাহমী ঃ এ শিক্ষকের নিকটও তিনি নাহু ও 'আরবী সাহিত্য পাঠ করেন। কাওয়া'ঈদুল ই'রাব ও আযহারী প্রণীত তার শরাহ, সায়্যিদ মুফতীর কাফিয়ার শরাহ, কাফিয়ার শরাহ শারহুল খুযাইমী, কাজী যাকারিয়ার শারহুল ইসাগুজী, আল কাফিল এবং ইবন লুকমান কর্তৃক তার

---

৫৬. আশ্‌ শাওকানী, নাইলুল আওতার, খ.১ ভূমিকা, পৃ. ﻠ ; আশ্‌ শাওকানী ফতহুল কাদীর, খ. ১ পৃ ২২; জালালউদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫-১৬।

৫৭. আশ্‌ শাওকানী, আল বাদরুত্‌ তালি', খ. ১, পৃ. ৪৮৪; আশ্‌ শাওকানী, নাইলুল আওতার, প্রাগুক্ত, পৃ . ﻡ; আশ্‌ শাওকানী ফাতহুল কাদীর প্রাগুক্ত ; জালাল উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

৫৮. আশ্‌ শাওকানী, নাইমুল আওতার, প্রাগুক্ত, আশ্‌ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, প্রাগুক্ত।

৫৯. প্রাগুক্ত।

শরাহ, আল আমীর আল হুসাইনের শিফা প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি এ শিক্ষককে পাঠ করে শুনান।[৬০]

৫. আল কাসিম ইবন ইয়াহইয়া আল খাওলানী ঃ এ শিক্ষকের নিকটেও তিনি নাহু এবং 'আরবী পাঠ করেন। তাছাড়া তিনি কাফিয়া, শারহুল যুবাইনী, শরহুর রিজা, (কাফিয়ার শরাহ) লুৎফুল্লাহিল গিয়াছ এর শারহুশ্ শাফিয়া ও তালখীসুল মিফতাহ, সিরাজী, তাফতাযানী ও ইয়াযদির শারহুত তাহযীব, শারহুল গায়াহ, ইবনু দাকীকের 'উমদাহ্, ইবন হাজারের নুখবাতুল ফিকর ও তার শরাহ্ আর রিসালাতুল আজদিয়া ফি আদাবিল বাহাছ, শারহুত তালখীস আল মুখতাসার প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর নিকট পাঠ করেন।[৬১]

৬. আল হাসান ইবন ইসমা'ঈল আল মাগরিবী ঃ এ শিক্ষকের নিকট তিনি 'আরবী এবং নাহু ছাড়াও কুতুবের শারহুশ্ শামসিয়্যাহ, আরহুল আজদ, তাফসীরুল কাশশাফ ও তার টীকা প্রভৃতি পাঠ করেন এবং মুনজিরীর টীকা সহ সুনানু আবি দাউদ, শারহুন্ নববীর অংশ বিশেষ, খাত্তাবীর মা'আলীমুস সুনান এর অংশ বিশেষ এবং শারহু ইবন রাসলানের অংশ বিশেষ, আত তানকীহ ফি 'উলুযিল হাদীছ, শারহুল বুলুগিল মারাম প্রভৃতি শ্রবণ করেন।[৬২]

৭. 'আব্দুর রাহমান ইবন হাসান আল আকওয়া' ঃ এ শিক্ষকের নিকট তিনি 'আরবী ও নাহু শাস্ত্র শিক্ষা করেন এবং আল আমীর আল হুসাইনের আশ্ শিফার প্রথম অংশ শ্রবণ করেন।[৬৩]

৮. 'আব্দুল কাদীর ইবন আহমাদ ঃ এ শিক্ষকের নিকট আশ্ শাওকানী সহীহ মুসলিম, জামি'উত্ তিরমিযী, ইমাম মালিকের মুয়াত্তার পূর্ণাংশ এবং সুনানু আন্ নাসাঈ, সুনানু ইবন মাজাহ, কাজী ইয়াজের শিফা, জামি'উল উসূল এর একাংশ এবং শারহু জাম'ইল জাওয়ামি' লিল মুহাল্লা, ইবন তাইমিয়ার আল মুনতাকা এবং ইবন আবি শরীফের হাশিয়া, আন্ নাজরীর শারহুল কালাইদ ও শরীফের শারহুল মাওয়াফিক আল আজদিয়া আল বাহরুয যুখার, জুউন নাহার 'আলা শারহিল আযহার, ফাতহুল বারীর একাংশ, হাফিয যায়নুদ্দীন 'আব্দুর রাহীম ইবনুল হুসাইন আল 'ইরাকীর আলফিয়ার অংশ বিশেষ এবং আল জারার এর

---

৬০. আশ্ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, প্রাগুক্ত; নাইমুল আওতার, প্রাগুক্ত, পৃ.. م ،ن ،س ; জালাল উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮।

৬১. আশ্ শাওকানী, প্রাগুক্ত; জালাল উদ্দীন, প্রাগুক্ত।

৬২. আশ্ শাওকানী, প্রাগুক্ত।

৬৩. আশ্ শাওকানী, নাইমুল আওতার, প্রাগুক্ত, পৃ. س; ফাতহুল কাদীর, প্রাগুক্ত।

ছন্দ প্রকরণ গ্রন্থ মানজুমাহ ও তার শরাহ, জাওহারীর সিহাহ ও কামুসের অংশ বিশেষ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ করেন।[৬৪]

৯. 'আলী ইবন হাদী আরহাব ঃ এ শিক্ষকের নিকট আশ্ শাওকানী শারহুত তালখীস, আল মুখতাসারের ভূমিকা, তাফতাযানীর আশ শারহুল মুতুল এবং জালবী ও শরীফের হাশিয়া পাঠ করেন।[৬৫]

১০. ইয়াহ্ইয়া ইবন মুহাম্মাদ আল হুতী ঃ আশ্ শাওকানী এ শিক্ষকের নিকট ফারায়িজ, ওয়াসায়া, ইবনুল হাযিমের মুনাসাখা পদ্ধতি প্রভৃতি শিক্ষা করেণ।[৬৬]

১১. 'আল্লামা 'আব্দুল কাদির ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনুন্ নাসির কুকবানী (১১২৫ হি.–১১৯৮ হি) ঃ অংক ও ফারায়িজ শাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। 'আল্লামা আশ্ শাওকানী তাঁর নিকট তাফসীর, হাদীস, 'আকাইদ, ফারায়িজ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।[৬৭]

১২. মুহাম্মাদ ইবন হাশিম ইবন ইয়াহ্ইয়া আশ্ শামী (১১৪০ হি.–১২০৭ হি.) ঃ আশ্ শাওকানী তাঁর নিকট হতে নাহু, সরফ, অংকশাস্ত্র, তাফসীর, হাদীছ, কবিতা, কাসিদা প্রভৃতি শিক্ষা গ্রহণ করেন।[৬৮]

১৩. 'আল্লামা আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল্ কাতিন (১১৬৩ হি.–১২৩৭ হি.) ঃ তিনি ইয়ামানের একজন বড় জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর নিকট আশ্ শাওকানী নাহু, সরফ, তাফসীর ও হাদীছের শিক্ষা গ্রহণ করেন।[৬৯]

১৪. 'আব্দুল কাদির ইবন আহমাদ ইবন আব্দুল কাদির ইবন নাসির (১১৩৫–১২০৭ হি.) ঃ তাঁর নিকট আশ্ শাওকানী পূর্ণ সহীহ মুসলিম, শারহুন্ নববী, সহীহ আল বুখারী ও ফাতহুল বারীর অংশ বিশেষ পাঠ করেন।[৭০]

উল্লেখিত শিক্ষকবৃন্দ সে সময়ের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞ পন্ডিত ছিলেন। তাঁদের সাহচর্য লাভ ও তাঁদের নিকট জ্ঞান চর্চা করে আশ্ শাওকানী বিশ্বখ্যাত পন্ডিতে পরিণত হন। একই সময়ে অনেক বিষয়ে বিশেষ পন্ডিত্য আশ্ শাওকানীকে বিশেষ মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে। এটি তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচায়ক। প্রতিটি বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান ও স্বচ্ছ ধারণাই তাঁকে ইজতিহাদের পথ দেখিয়েছে। ফলে কারো অন্ধ অনুসরণের পরিবর্তে তিনি স্বতন্ত্র চিন্তা শক্তির অধিকারী ব্যক্তিত্বে পরিণত হন।

---

৬৪. আশ্ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, প্রাগুক্ত; নাইমুল আওতার, প্রাগুক্ত, পৃ. ع، س، ن
৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ن
৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ع
৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫।
৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮।
৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।
৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

বিদ্যার্জনের জন্য সফর

'আল্লামা আশ্ শাওকানী নিজ শহর সান'আতেই অধ্যয়ন করেন। বিদ্যার্জনের জন্য তিনি অন্য কোন দেশ সফরে যান নি। এর কারণ তার পিতা-মাতা তাঁকে দেশ ছেড়ে ভ্রমণ করার অনুমতি দেন নি। অধিকন্তু তিনি পাঠগ্রহণ ও পাঠদানে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে, অন্য কোথাও সফর করার ফুরসত-ই পান নি।[৭১]

ছাত্র জীবনেই তিনি জ্ঞানী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ফলে বহু শিক্ষার্থী তখন থেকেই তাঁর নিকট বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ শুরু করেন। আশ্ শাওকানী তাঁর শিক্ষকদের নিকট শিক্ষা গ্রহণের পাশপাশি শিক্ষাদানের কাজেও আত্ম নিয়োগ করেন। শিক্ষকদের নিকট হতে পাঠ শেষে বের হয়ে তিনি ছাত্রদেরকে পাঠদানের কাজ শুরু করতেন। অনেক সময় শিক্ষকদের নিকট হতে আশ্ শাওকানী বের হওয়ার পূর্বেই তাঁর ছাত্রগণ সমবেত হতেন। শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানের কাজে অতি মাত্রায় ব্যস্ত থাকাও তাঁর বাইরে সফর না করার একটি কারণ।[৭২]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কর্মজীবন

আমৃত্যু জ্ঞান সাধনার অন্যতম সাধক 'আল্লামা আশ্ শাওকানীর শিক্ষাজীবন থেকে কর্মজীবনকে আলাদা করাই কঠিন। তাঁর কর্মজীবন মূলত শিক্ষা কার্যক্রমকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। তিনি একাধারে লেখক, শিক্ষক এবং মুফতি ছিলেন।[৭৩] পাশাপাশি তিনি সান'আর বিচারকের দায়িত্বও পালন করেন।[৭৪] তাঁর ব্যাপারে আল বাদরুত তালি' গ্রন্থে বলা হয়েছে, "তিনি অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, ফাতওয়া দান, গ্রন্থ প্রণয়ন প্রভৃতির মাধ্যমে সর্বদা জ্ঞান চর্চার কাজে ব্যস্ত থাকতেন। পিতৃগৃহে বসবাস করে তিনি জ্ঞানী ও সাহিত্যিকদের মজলিসে যোগদান, তাদের সাথে সাক্ষাৎ এবং জ্ঞানের আদান-প্রদানে ব্যস্ত থাকতেন।"[৭৫]

এ প্রসঙ্গে 'আল্লামা আশ্ শাওকানীর অন্যতম ছাত্র 'আল্লামা আল মুহসিন ইবনুল হুসাইন আল আনসারী বলেন, "তিনি সর্বদা 'ইবাদাত-বন্দেগী, বাহ্যিক ও তাত্ত্বিক জ্ঞানের অনুশীলন, বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন, দ্বীনি জ্ঞান চর্চা ও গ্রন্থ রচনায় রত থাকতেন।"[৭৬] তাঁর কর্ম জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে পেশ করা হলোঃ

---

৭১. আশ্ শাওকানী, আল্ বাদরুত্ তালি', খ. ২, পৃ. ২১৮।
৭২. প্রাগুক্ত।
৭৩. এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলাম, খ. ৯, পৃঃ ৩৭৮
৭৪. জালাল উদ্দীন, প্রাত্তক পৃ. ২০; শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, খ. ১, পৃ. ২৩
৭৫. আশ্ শাওকানী, আল বাদরত তালি' খ. ২, পৃ. ২২৪
৭৬. জালাল উদ্দীন প্রাগুক্ত, পৃ, ১৯।

শিক্ষকতা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'আল্লামা আশ্ শাওকানীর কর্মজীবন আবর্তিত **হয়েছে** শিক্ষাকে কেন্দ্র করেই। তিনি ছাত্র জীবন থেকেই শিক্ষকতার কাজ **শুরু করেন**। শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি শিক্ষকতায় পুরোপুরি আত্ম নিয়োগ করেন এবং অধিকাংশ সময় এ কাজেই ব্যয় করেন। তিনি শিক্ষাদান কাজে এতটাই নিমগ্ন হয়ে পড়েন যে, একদিনেই দশটি বা তার চেয়েও বেশি পাঠদান করতেন। এ প্রসঙ্গে 'আব্দুল হাকীম কাজী বলেন, "তিনি অধিকাংশ সময় পাঠদান কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতেন । এমনকি দিনে তাঁর পাঠ দানের সংখ্যা তেরটি পর্যন্ত পৌঁছত।"[৭৭] এ প্রসঙ্গে আল্ বাদরুত তালি' গ্রন্থে বলা হয়েছে " অত:পর তিনি শিক্ষার্থীদের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করে দেন। এবং তাঁর নিকট হতে ছাত্ররা প্রতি দিন বিভিন্ন বিষয়ে দশটির বেশি পাঠ গ্রহণ করেন।[৭৮]

এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি শিক্ষাদানের ব্যাপারে কত তৎপর ও আন্তরিক ছিলেন। শিক্ষা বিস্তারে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল নিরলস। অন্য কোন ব্যস্ততাই তাঁকে এ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারেনি।

বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান

ছাত্র জীবনে 'আল্লামা আশ্ শাওকানী বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেন। শিক্ষকতার জীবনেও তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই মনীষী নির্দিষ্ট কোন একটি বিষয়ের শিক্ষক ছিলেন না। বরং তিনি একই সাথে বহু বিষয়ের শিক্ষাদান করতেন। তিনি যে সকল বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন তার মধ্যে ছিলো :

তাফসীর, উসূলে তাফসীর, হাদীছ, উসূলে হাদীছ, ফিকহ, উসূলে ফিকহ, 'আরবী সাহিত্য, নাহু, সরফ, বিজ্ঞান, অলংকার শাস্ত্র যুক্তিবিদ্যা (মানতিক), তর্কশাস্ত্র, ছন্দ:প্রকরণ বিদ্যা, শরীর বিদ্যা, প্রকৃতি বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, পরিবেশ বিদ্যা প্রভৃতি । তিনি এ শাস্ত্রগুলোর এককেটি বিভিন্ন সময় এবং কোন কোন সময়ে একত্রে অনেকগুলো বিষয় শিক্ষাদান করতেন।[৭৯] আশ্ শাওকানী একজন গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষক হওয়ার কারণে শিক্ষাদান কার্যক্রমের মাধ্যমে তাঁর জ্ঞানের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সুখ্যাতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এ প্রসঙ্গে 'আব্দুল হাকীম কাজী বলেন , "সল্প সময়েই তার শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে এবং তাঁর সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।"[৮০]

---

৭৭. আশ্ শাওকানী , ফাতহুল কাদীর, খ. ১, পৃ. ২৩
৭৮. আশ্ শাওকানী আল বাদরুত তালি' খ. ১, পৃ. ২১৯।
৭৯. আশ্ শাওকানী, ফাতহুল কাদ্দীর, খ. ১, পৃ . ২৩; আল বাদরুত তালি', খ . ২ . পৃ . ২১৯ ; জালাল উদ্দীন প্রাগুক্ত , পৃ. ১৯- ২০ ।
৮০. আশ্ শাওকানী , ফাতহুল কাদীর প্রাগুক্ত ।

তাঁর খ্যাতিমান ছাত্র বৃন্দ

আশ্ শাওকানী জ্ঞানের জগতে সে যুগের অনন্য ব্যক্তিত্ব ও মুখপাত্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। বহু বিষয়ে তাঁর পরিপক্ক জ্ঞান ছাত্রদেরকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে। তাঁর পান্ডিত্যের গভীরতার সুখ্যাতি এবং শিক্ষক হিসেবে তাঁর সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ায় বহুসংখ্যক শিক্ষার্থী তাঁর নিকট শিক্ষা লাভের জন্য ভীড় জমায়। বিভিন্ন স্থান থেকে জ্ঞান লাভের জন্য লোকেরা তাঁর নিকট আগমন করত। তিনি তাদেরকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে শিক্ষাদান করতেন। তাঁর এ অকৃপণ জ্ঞান বিতরণের ফলে বহু শিক্ষার্থী পরবর্তী কালে জ্ঞানের জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করে ।

"যেমন উসতাদ তেমন শাগরিদ" এ প্রবচনের পূর্ণ প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় ইমাম আশ্ শাওকানীর জীবনে। তিনি যেমন উচু মাপের পন্ডিত ছিলেন, তেমনি তাঁর সাহচর্য ও শিক্ষাদানের ফলে ছাত্ররাও বড় বড় পন্ডিতে পরিণত হয় ।

তাঁর নিকট থেকে এত বেশি সংখ্যক ছাত্র শিক্ষা লাভ করে যে, তাদের প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তাঁর ছাত্রদের অধিকাংশই স্ব- স্ব- ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। তাদের অধিকাংশই ছিল অনুসন্ধিৎসু চিন্তাবিদ, বিচক্ষণ পন্ডিত, গভীর জ্ঞান এবং বিরল মেধা ও মর্যাদার অধিকারী ।

নিম্নে তাঁর খ্যাতিমান ছাত্রদের কয়েকজনের বিবরণ পেশ করা হলো :

১। ইয়াহ্ইয়া ইবন 'আলী (১১৯০ হি.–১২৬৭ হি.) ঃ 'আল্লামা আশ্ শাওকানীর ভাই। তিনি আশ্ শাওকানীর নিকট নাহু, সরফ, মানতিক, ফিক্হ, উসূলে ফিক্হ প্রভৃতির শিক্ষা নেন।[৮১]

২। হুসাইন ইবন মুহাম্মাদ (১১৮৮ হি.–১২৩৫হি.) ঃ আশ্ শাওকানীর নিকট তিনি নাহু, সরফ, মানতিক, অলংকার শাস্ত্র, উসূল, শারহুর রিজা , শারহু মুস্তাকাল আখবার প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন।[৮২]

৩। হুসাইন ইবন আলী (১১৭০ হি.–১২২৫ হি.) ঃ আশ্ শাওকানীর নিকট তিনি নাহু, সরফ, মানতিক, অলংকার শাস্ত্র, উসূল ও শারহুর রিজা অধ্যয়ন করেন।[৮৩]

৪। 'আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন হাসান (১১৭০ হি.–১২৩৪ হি.) ঃ আশ্ শাওকানীর নিকট তিনি নাহু, সরফ, মানতিক, অলংকার শাস্ত্র, উসূল, হাদীছ এবং ফিক্হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।[৮৪]

---

৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।
৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।
৮৩. প্রাগুক্ত।
৮৪. প্রাগুক্ত।

৫। 'আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান সান'আনী (১১৭০ হি.–১২১২ হি.)ঃ 'আল্লামা আশ্ শাওকানীর নিকট তিনি নাহু, সরফ, অলংকার শাস্ত্র ও উসূল অধ্যয়ন করেন।[৮৫]

৬। 'আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ হারাবী (১১৯৪ হি.–১২৪৫হি.) ঃ আশ্ শাওকানীর নিকট তিনি হাদীছ, তাফসীর, নাহু, সরফ, প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।[৮৬]

৭। মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ সান'আনী (১১৮৬ হি.–১২১৩ হি.) ঃ আশ্ শাওকানীর নিকট তিনি ফারায়িজ, শারহুর রিজা, জামি'উত্ তিরমিযি, সুনানু আবি দাউদ প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন।[৮৭]

৮। আলী ইবন ইয়াহইয়া ঃ ১১৫৯ হি.–১২৩৬ হি.) ঃ তিনি আশ্ শাওকানীর নিকট তাফসীরুল কাশ্শাফ, তাফসীরে ফাতহুল কাদীর, সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানু আবি দাউদ প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন।[৮৮]

৯। আহমাদ ইবন লুৎফুল বারী (১১৯২ হি.–১২৮২ হি.) ঃ তিনি আশ্ শাওকানীর নিকট জুউন্ নাহার, মুহাল্লার শরাহ জাম'উল জাওয়ামি', তাফসীরে ফাতহুল কাদীর ও হাদীছ অধ্যয়ন করেন। [৮৯]

১০। সায়্যিদ আহমাদ ইবন 'আলী সান'আনী ঃ (১১৫০ হি.-১২২৩ হি.)ঃ তিনি 'আল্লামা আশ্ শাওকানীর নিকট তাফসীর, হাদীছ, নাহু, সরফ, মানতিক, উসূল, অলংকার শাস্ত্র প্রভৃতির শিক্ষা নেন। [৯০]

১১। 'আব্দুল ওয়াহ্হাব ইবন মুহাম্মাদ (১১৮৪ হি.–১২৩৫ হি.) ঃ আশ্ শাওকানীর নিকট তিনি তাফসীর, হাদীছ, ফিক্হ, উসূল প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।[৯১]

১২। মুহাম্মাদ ইবন 'ইয্যুদ্দীন (১১৮০ হি.–১২৩২ হি.) ঃ তিনি দীর্ঘদিন আশ্ শাওকানীর নিকট অবস্থান করে নাহু, সরফ, মানতিক, বালাগাত , হাদীছ, ফিকহ, উসূল প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন।[৯২]

১৩। মুহাম্মাদ ইবন 'আলী (১১৯৪হি.–১২৬৪ হি.) ঃ আশ্ শাওকানীর নিকট তিনি আল উম্মাহাতুস সিত্তু, আল আজ্দ, আল মুতাওয়্যাল, আল কাশ্শাফ প্রভৃতি এবং আশ্ শাওকানীর প্রণীত অধিকাংশ গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন।[৯৩]

---

৮৫. প্রাগুক্ত।
৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৪৬।
৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।
৮৮. প্রাগুক্ত।
৮৯. প্রাগুক্ত।
৯০. প্রাগুক্ত।
৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫।
৯২. প্রাগুক্ত।
৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬।

১৪। 'আল্লামা মুহাম্মাদ আল কারদী (১১৮৮ হি.-১২৪৮ হি.) ঃ আশ্ শাওকানীর নিকট তিনি নাহু, সরফ, মানতিক, বালাগাত, তাফসীর, হাদীছ, সায়লুল হারায প্রভৃতি শিক্ষা লাভ করেন।[৯৪]

১৫। 'আলী ইবন মুহাম্মাদ আশ্ শাওকানী ঃ তিনি 'আল্লামা শাওকানীর পুত্র। ইয়ামানের শাওকান নামক স্থানে ১১৯৭ হিজরীতে রবিউল আউয়াল মাসের শুক্রবার তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পিতা আশ্ শাওকানীর নিকট নাহু, সরফ, কুরআন, তাফসীর, হাদীছ, ফিকহ, উসূল, 'আকাইদ প্রভৃতি শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ছিলেন ইয়ামানের বড় পন্ডিতদের একজন। তিনি ইতিহাস ও ফাতওয়া দানে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি ত্বরিৎ মুখস্থকরণ শক্তি, মজবুত বোধশক্তি এবং সূক্ষ্ম সমঝশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি ১২৫০ হিজরী জামাদিউল আওয়াল মাসে পিতার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন।[৯৫]

১৬। হুসাইন ইবন মুহসিন (১১৮০হি.-১২৫৫ হি.) ঃ তিনি 'আল্লামা আশ্ শাওকানীর মূল ছাত্রদের একজন। ইয়ামানের সান'আতে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। নাহু, সরফ, মানতিক, ফিকহ, উসূল, হাদীছ, তাফসীর, বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। নাইলুল আওতারের ভূমিকায় আশ্ শাওকানীর জীবনী তিনি লিখেছেন।[৯৬]

'আল্লামা আশ্ শাওকানীর অসংখ্য ছাত্রের মধ্য হতে উপরে প্রসিদ্ধ কয়েকজনের বিবরণ পেশ করা হলো। এত বিপুল সংখ্যক ছাত্রকে বহু সংখ্যক বিষয়ে পাঠ দান থেকে অনুধান করা যায় যে, তিনি প্রায় সকল বিষয়ে প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এখান থেকে এও আঁচ করা যায় যে, তিনি একজন অতি উঁচু মাপের শিক্ষক ছিলেন। তিনি দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে শিক্ষা দান করতেন বলেই সে সময়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ তাঁর নিকট শিক্ষা লাভের জন্য ভীড় করতেন। জ্ঞান বিস্তারে তাঁর অসাধারণ অবদান চির স্মরণীয় হয়ে রয়েছে এবং তাঁকেও চির স্মরণীয় করে রেখেছে।

জ্ঞান বিস্তারে তাঁর অবদানের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে মুহাম্মাদ আব্দুল হাকীম কাজী বলেন, "অধিকাংশ সময় তিনি নিজেকে শিক্ষাদানের কাজে নিয়োজিত রাখেন। তাফসীর, উসূলে তাফসীর, হাদীছ, উসূলে হাদীছ, ফিক্হ, উসূলে ফিকহ, 'আরবী সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর শিক্ষাদান কার্যক্রম ব্যাপক ব্যাপ্তি লাভ করে এবং চতুর্দিকে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।"[৯৭]

---

৯৪. প্রাগুক্ত।
৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।
৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।
৯৭. আশ্ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, খ. ১, পৃ. ২৩।

ফাতওয়া[৯৮] দান

'আল্লামা আশ্ শাওকানীর দ্বীনী খেদমতসমূহের অন্যতম ছিল ফাতওয়া দান। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি সান'আবাসীকে বিভিন্ন বিষয়ে ফাতওয়া দান করতেন। ফাতওয়া দানে বিশেষ পারদর্শিতার কারণে অল্প সময়েই তিনি প্রদিদ্ধি লাভ করেন। ফলে সান'আ ছাড়াও তিহামা এবং অন্যান্য স্থান থেকেও লোকেরা তাঁর নিকট ফাতওয়ার জন্য আগমন করতো। তিনি কুরআন, সুন্নাহ ও এতদোভয়ের আলোকে ইজতিহাদ বা গবেষণার দ্বারা ফাতওয়া প্রদান করতেন এবং তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতেন। ২০ বছর বয়স থেকেই তিনি ফাতওয়া দান কার্যক্রম শুরু করেন।[৯৯]

ফাতওয়া প্রদানের বিনিময়ে তিনি কোন সম্মানী বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন না। কেউ কোন বিনিময় প্রদানের জন্য পীড়াপীড়ি করলে তিনি বলতেন, আমি কোন বিনিময় ছাড়াই জ্ঞান আহরণ করেছি। সুতরাং তা আমি বিতরণও করবো সেভাবেই।"[১০০] মৌখিকভাবে প্রশ্ন করা ছাড়াও বহু লোক তাঁর নিকট লিখিতভাবে প্রশ্ন পাঠাতেন। 'আল্লামা আশ্ শাওকানী লিখিতভাবে সেগুলোর জবাব দিতেন। তাঁর প্রদত্ত ফাতওয়া ও লিখিত জবাবসমূহের যে সংকলন রয়েছে , তা বড় তিনটি খন্ডে রূপলাভ করেছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে "আল ফাতহুর রব্বানী ফি ফাতাবিয়িশ্ শাওকানী"।[১০১] লেখক ও শিক্ষক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভের পাশাপাশি তিনি মুফতী হিসেবেও ব্যাপক পরিচিতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এ প্রসঙ্গে এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলামে বলা হয়েছে, 'Muhammad B. Ali b. Muhammad was a writer, teacher and

---

৯৮. ফাত্ওয়া শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসার জবাব দেয়া, কোন বিষয়ে অভিমত দেয়া, সমস্যার সমাধান দেয়া, উপদেশ দেয়া, পরামর্শ দেয়া, Formal legal opinion বা বিধিবদ্ধ আইনী অভিমত ইত্যাদি। (লুইস মা'লুফ, আল্ মুনজিদ, (বৈরুত : দারুল মাশরিক., ২২ সং, ১৯৭৩ ইং) পৃ. ৫৬৯; J.M Cowan,The hans wehr dictionary of modern written Arabic, 3rd edition, New York,1976, p. 696.) যিনি এ সকল জিজ্ঞাসার জবাব দেন বা কোন বিষয়ে আইন সংগত অভিমত দেন বা দেয়ার যোগ্যতা রাখেন, তাকে মুফতি বলা হয়। মুফতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে প্রসিদ্ধ 'আরবী অভিধান আল্ মুনজিদ এ বলা হয়েছে : الفقيه الذى يعطى الفتوى و يجب عما القى عليه من المسائل المتعلقة بالشريعة "মুফতি হলেন সেই ফকীহ্ বা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, যিনি ফাত্ওয়া দিয়ে থাকেন এবং শরী'আত সংশ্লিষ্ট যে সকল মাসয়ালা-মাসায়িল তার উপর আরোপিত হয়, তার জবাব দেন।" (লুইস মা'লুফ, প্রাগুক্ত) John Milton Cowan مفتىএর অর্থ করেছেন, Deliverer of formal legel opinions, Official expounder of Islamic law 'বিধিবদ্ধ আইনী অভিমত প্রদানকারী', 'ইসলামী আইনের অফিসিয়াল বা দায়িত্বশীল ব্যাখ্যাদানকারী'| (J.M Cowan,. প্রাগুক্ত) মুফতি ইসলামী শরী'আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা, যার অর্থ হলো আইনবিদ বা আইন বিশেষজ্ঞ।

৯৯. আশ্ শাওকানী, প্রাগুক্ত; শাওকানী, আল্ বাদরুত তালি' খ. ২, পৃ. ২১৯।

১০০. আশ্ শাওকানী, আল্ বাদরুত্ তালি', প্রাগুক্ত।

১০১. আশ্ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, প্রাগুক্ত; জালাল উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

mufti in San`a" "মুহাম্মাদ ইবন 'আলী ইবন মুহাম্মাদ সান'আর একজন লেখক, শিক্ষক ও মুফতী ছিলেন।"[১০২]

'আল্লামা আশ্ শাওকানী ইসলামী আইনে একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা ও বিভিন্ন বিষয়ে আইনী সমাধানে তিনি ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী। ফলে তিনি আইনজ্ঞ বা মুফতি হিসেবে সবার নিকট অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য ও আস্থাভাজন ছিলেন।

গ্রন্থ রচনা

'আল্লামা আশ্ শাওকানী একজন উচুমাপের লেখক ছিলেন। তাঁর ক্ষুরধার লেখনী ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাঁর জ্ঞানের ব্যাপক ব্যাপ্তির মত লেখনীও ছিল ব্যাপক বিস্ত ত। সমকালীন প্রায় সকল বিষয়ের উপরই তিনি কলম ধরেছিলেন।

তাফসীর, হাদীছ, উসূলে হাদীছ, উসূলে ফিকহ 'আকাইদ, আহকাম, ফাতওয়া, সাহিত্য, কবিতা, ব্যাকরণ ও অলংকারশাস্ত্র, বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধীদের জবাবদান, মানতিক, ইতিহাস, জীবনীগ্রন্থ, রিকাক, (চমকপ্রদ বর্ণনা) পরিচিতিমূলক উপাখ্যান প্রভৃতি বহু বিষয়ে তিনি লিখেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ছোট-বড় একশতটিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

'আল্লামা 'আব্দুর রাহমান আল আহদাল বলেন, "আল্লামা আশ্ শাওকানীর প্রণীত গ্রন্থের সংখ্যা ১১৪টি।"[১০৩]

'আল্লামা আশ্ শাওকানী ছিলেন একজন গবেষক ও চিন্তাবিদ। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর লব্ধ জ্ঞান ও চিন্তাধারাকে লোকদের নিকট পৌছানোর জন্যই তিনি গ্রন্থ প্রণয়নে মনোনিবেশ করেন। আশ্ শাওকানীর লেখা "আল্ বাদরুত তালি'" ২য় খন্ডে এবং "নাইলুল আওতার" ও "ফাতহুল কাদীর" এর ভূমিকায় তাঁর লিখিত গ্রন্থের বিবরণ পাওয়া যায়। তাছাড়া জালালউদ্দীন তাঁর এম.ফিল. গবেষণাপত্র "আল্লামা আশ্ শাওকানী 'আবকারিয়্যাতুহু ওয়া মানহাজুহু ফি তাফসীরিহি" তে আশ্ শাওকানীর প্রণীত গ্রন্থের বিবরণ দিয়েছেন। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে এ সকল গ্রন্থের মধ্যে কতগুলো মূল গ্রন্থ, আবার কতগুলো বিভিন্ন বিষয় বা আহকামের বিভিন্ন শাখা- প্রশাখার উপর লিখিত রিসালাহ বা ক্ষুদ্র পুস্তিকা। এ ক্ষুদ্র পুস্তিকা গুলোর কোনটি নির্দিষ্ট বিষয়ের লিখিত ফাতওয়া, কোনটি লিখিত প্রশ্নের লিখিত জবাব, কোনটি নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের উপর লেখা, কোনটি বিরোধীদের যুক্তি খন্ডন করে লেখা, আবার কোনটি ভ্রান্ত মতবাদের অসারতা প্রমাণে লেখা।

---

১০২. The Encyclopaedia of Islam, vol. 9, p.378
১০৩. প্রাগুক্ত; জালাল উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

তাঁর গ্রন্থ ও রিসালাগুলোর মধ্য হতে কয়েকটির নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

মূল গ্রন্থ

১. ফাতহুল কাদীর আল জামিউ বাইনা ফান্নায়ির রিওয়ায়াহ ওয়াদ দিরায়াহ মিন উলুমিত তাফসীর।
২. নাইলুল আওতার শারহু মুন্তাকাল আখবার
৩. আল ফাওয়ায়িদুল মাজমু'আ ফিল আহাদিছিল মাওজু'আ
৪. ইত্তিহাফুল আকাবির বি ইসনাদিদ দাফাতির
৫. আদ দারারিয়্যুল মাজিয়াহ শারহুদ দুরারুল বাহিয়্যাহ
৬. আত্ তা'আক্কুবাতু 'আলাল মাওজু'আত
৭. আদ্ দুরারুল বাহিয়্যাহ ফিল মাসয়িলিল ফিকহিয়্যাহ
৮. আস সায়লুল জারার 'আলা হাদায়িকিল আযহার
৯. আদ্ দুরারুন নাজিদ ফি ইখলাছি কারিমাতিত্ তাওহীদ
১০. ইরশাদুল ফুহুল ইলা তাহকীকিল হাক্কি ফি 'উলুমিল উসূল
১১. আল কাওলুল মুফীদ ফি আদিল্লাতিল ইজতিহাদ ওয়াত তাকলীদ
১২. আদাবুত্ তালবি ওয়া মুনতাহাল 'আরব
১৩. আল ফাতহুর রাব্বানী ফি ফাতাবিয়িশ শাওকানী। এটি আশ্ শাওকানী প্রদত্ত বিভিন্ন ফাত্ওয়ার সংকলন।
১৪. ইরশাদুছ ছিকাত ইলা ইত্তিফাকিশ শারায়ি'ই আলাত তাওহীদ ওয়াল মী'আদ ওয়ান নুবুওয়্যাত
১৫. তুহফাতুয যাকিরীন বি-'ইদ্দাতি হিসনুল হাসীন মিন কালামি সায়্যিদিল মুরসালীন
১৬. নুযহাতুল ইহদাক ফি 'ইলমিল ইশতিকাক
১৭. আল বাদরুত তালি' বি-মাহাসিনি মিম বা'দিল কারনিস সাবি'
১৮. আল ই'লামু বিল মাশায়িখিল আ'লাম ওয়াত তালামিযাতুল কিরাম
১৯. হাশিয়াতু শিফায়িল আওয়াম
২০. আল মুখতাসারুল বাদী' ফিল খালকিল ওয়াসী'
২১. আল মুখতাসারুল কাফী মিনাল জাওয়াবিশ শাফী
২২. ফাতহুল কাদীর ফিল ফারকি বায়নাল মু'আয্যারাতি ওয়াত তা'যীর
২৩. বুগিয়াতুল আরীব মিম মুগনীয়িল লাবীব
২৪. কিফায়াতুল মুহতায
২৫. রাফ্'উল খিসাম ফিল হুকমি বিল 'ইলমি মিনাল আহকাম
২৬. ইজাহুদ দালালাত 'আলা আহকামিল খিয়ারাত
২৭. দাফ্উল ই'তিরাজাত 'আলা ইজাহিদ দালালাত।[১০৪]

১০৪. আশ্ শাওকানী, আল্ বাদরুত তালি', খ. ২, পৃ. ২২৪

Contents

রিসালা বা ক্ষুদ্র পুস্তিকা

১. আল বাহছু ফিল আ'মাল
২. আল কাওলুল মাকবুল ফি ফায়জানিল গুযুল ওয়াস সুয়ুল
৩. আল কাওলুল হাসান ফি ফাজায়িলি আহলিল ইয়ামান
৪. আর রাওজুল ওয়াসী' ফিদ দালীলি 'আলা 'আদামি ইনহিসারি 'ইলমিল বাদী'
৫. আহকামুল ইসতিজ্মার
৬. আল কালামু 'আলা উজুবিস সালাত 'আলান নাবিয়্যি ফিস সালাত
৭. আল কাওলুস সাদিক ফি ইমামাতিল ফাসিক
৮. হুকমুত তালাকি ছালাছান
৯. হুকমু তালাকিল বিদ'ঈ
১০. ইরশাদুস্ সায়িল ইলা দালায়িলিল মাসায়িল
১১. আল মাবাহিছুদ্ দুর্রিয়্যা ফিল মাসয়ালাতিল হাযারিয়্যাহ

'আল্লামা আশ্ শাওকানীয় লিখিত ছোট-বড় বিশাল সংখ্যক গ্রন্থ থেকেই তাঁর জ্ঞানের পরিধি পরিমাপ করা যায়। তিনি যে বহু মাত্রিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বহু বিষয়ে লেখার দ্বারাই। গভীর জ্ঞানের অধিকারী ও জ্ঞান-গবেষণার মূর্ত প্রতীক এ মনীষী তাঁর ক্ষুরধার লেখনির সাহায্যে মুসলিম উম্মাহর জন্য এক স্থায়ী খেদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, তাঁর লেখা স্বপ্ল সংখ্যক গ্রন্থই প্রকাশিত হয়েছে এবং অধিকাংশেরই কোন সন্ধ্যান পাওয়া যায় না।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে তাফসীরে ফাতহুল কাদীর, নাইলুল আওতার শারহি মুন্ত াকাল আখবার, আল বাদরুত তালি', ফাতহুর রাববানী, আল ই'লাম বিল মাশায়িখিল আ'লাম ওয়া তালামিযাতুল কিরাম, আল কাসায়িসুস সালফিয়্যা, আদ দারারিয়্যুল মাজিয়াহ, আল কাওলুল মুফীদ ফি হুকমিত তাকলীদ, আত্ তাহফু বি মাযহাবিস সাল্ফ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

নিম্নে ফাতহুল কাদীর ও নাইলুল আওতার গ্রন্থদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো :

১. ফাতহুল কাদীর : এর পূর্ণ নাম "ফাতহুল কাদীর আল্ জামি'উ বায়না ফান্নায়ির রিওয়াইয়াতি ওয়াদ্ দিরাইয়াতি মিন 'ইলমিত্ তাফসীর"। ১২২৩ হিজরীর রবী'উল আখির মাসে 'আল্লামা আশ্ শাওকানী এ তাফসীর লেখা শুরু করেন এবং ১২২৯ হিজরীর রজব মাসে এটি লেখা সম্পন্ন করেন।[১০৫] ফাতহুল কাদীর তাফসীর শাস্ত্রের এক মৌলিক গ্রন্থ। এটিকে সাধারণ কোন তাফসীর নয়, বরং তাফসীর শাস্ত্রে বুনিয়াদী ও মূলনীতি সম্বলিত গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা হয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম আয্ যাহাবী বলেন,

---

১০৫. আয্ যাহাবী, আত্ তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন, খ. ২, পৃ. ২৫০।

يعتبر هذا التفسير اصلا من اصول التفسير و مرجعا مهما من مراجعه لانه جمع بين التفسير بالدراية و التفسير بالرواية فاجاد في باب الدراية و توسع في باب الرواية

"এ তাফসীরকে তাফসীর শাস্ত্রের অন্যতম মূলনীতি ও গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ, তিনি এ তাফসীরে বুদ্ধিবৃত্তি ও বর্ণনার সমাহার ঘটিয়েছেন। এ গ্রন্থে তিনি বুদ্ধিবৃত্তিকে অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন এবং বর্ণনার ক্ষেত্রকে করেছেন সুপ্রশস্ত।[১০৬]

এ তাফসীরের বৈশিষ্ট্য : তাফসীরটির অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো বুদ্ধিবৃত্তি (الدراية) ও বর্ণনা (الرواية) কে একত্রিকরণ। 'আল্লামা আশ্ শাওকানী এ তাফসীরে একদিকে কুরআনের বিভিন্ন শব্দ ও অর্থ বিশ্লেষণ পূর্বক বুদ্ধিবৃত্তিক যৌক্তিক উপস্থাপনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন, অপরদিকে হাদীছ ও বিভিন্ন তাফসীরকারকের বর্ণনাকে একত্রিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে আশ্ শাওকানী নিজেই উল্লেখ করেন,

"অধিকাংশ তাফসীরবিদ দু'ভাগে বিভক্ত এবং তাঁরা দু'ধরনের পন্থা অবলম্বন করেছেন। একদল তাঁদের তাফসীরে শুধু রিওয়ায়াত (বর্ণনা) উপস্থাপন করেছেন, পক্ষান্তরে অপর দল শুধু অর্থ ও ভাষাতত্ত্বের দিকেই দৃষ্টিপাত করেছেন, বর্ণনার দিকে দৃষ্টিপাত করেননি। যতটুকুও করেছেন, সেগুলোর আবার বিশুদ্ধতা-অশুদ্ধতা নির্ণয় করেননি। এ দু' দলই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সঠিক ও সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা অন্য একটি দিক বর্জন করায় তা পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ না থেকে উভয় বিষয়কে একত্রিত করা অত্যন্ত জরুরী। এ উদ্দেশ্যেই আমি এ বিষয়ে মনোনিবেশ করেছি এবং এ পদ্ধতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।"[১০৭]

এ তাফসীরে আশ্ শাওকানীর অবলম্বিত পদ্ধতি : 'আল্লামা আশ্ শাওকানী তাঁর এ প্রসিদ্ধ তাফসীরে যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, তা নিম্নে বর্ণিত হলো :

১. শানে নুযূল বর্ণনা ঃ এ তাফসীর গ্রন্থে আশ্ শাওকানী কুরআনের আয়াত উল্লেখের পর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নাযিলের প্রেক্ষাপট বা শানে নুযূল বর্ণনা করেছেন।

২. কিরাআত ঃ শব্দের কিরাআত বা পঠনরীতি আলোচনা তাফসীর শাস্ত্রের এক স্বীকৃত রীতি। 'আল্লামা আশ্ শাওকানী এ বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কিরাআতের বিভিন্ন রূপের বর্ণনা দিয়েছেন। কোন্ কিরাআত কোন্ কারীর সাথে সম্পর্কিত তা উল্লেখ করেছেন এবং কোন্ কিরাআতটি প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য তাও

---

১০৬. প্রাগুক্ত

১০৭. আশ্ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, খ. ১, পৃ. ৩০-৩১।

নির্দেশ করেছেন। তিনি বিভিন্ন শব্দস্থিত বর্ণের হরকত বা স্বরচিহ্নের বর্ণনা দিয়ে সঠিক কিরাআত বা উচ্চারণ কী তা নির্ধারণ করেছেন।

যেমন সূরা আল ইনশিকাকের ১৯ নং আয়াত لتركبن طبقا عن كبق "অবশ্যই তোমরা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহন করবে।" এর তাফসীর করতে গিয়ে আশ্ শাওকানী নিম্নোক্তভাবে কিরাআত বা পঠনরীতির বর্ণনা দেন :

হামযা, কাসাঈ, ইবন কাছীর এবং আবু 'আমর لَتَركَبَنَّ শব্দটির 'বা' বর্ণে যবর দিয়ে পড়েছেন। ফলে এর দ্বারা এক ব্যক্তিকে সম্বোধন করা বুঝিয়েছে, আর তিনি হলেন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অথবা প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যিনি নিজের সংশোধন কাজে নিয়োজিত। এটিই ইবন মাস'উদ, ইবন 'আব্বাস (রা.) এবং আবুল 'আলিয়া, মাসরূক, আবু ওয়াইল, মুজাহিদ, নখ'ঈ, শা'বী এবং সা'ঈদ ইবন যুবাইর (রহ.) এর কিরাআত। এতদ্ব্যতীত অন্যান্যরা শব্দটির 'বা' বর্ণে পেশ দিয়ে পড়েছেন। তখন এ শব্দটির সম্বোধন হবে সকল মানুষের প্রতি।

শা'বী এবং মুজাহিদ (রহ.) বলেন, প্রথম কিরাআতের আলোকে لَتَركَبَنَّ এর অর্থ হবে হে মুহাম্মাদ, এক আকাশ থেকে অন্য আকাশে আরোহন কর। কালবী (রহ.) বলেন, এর অর্থ হলো তুমি (হে নবী) আকাশে উর্ধ গমন কর। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো আল্লাহর নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে এবং এক পদমর্যাদা থেকে পরবর্তী পদমর্যাদায় উন্নীত হওয়া। অর্থাৎ অবস্থান ও মর্যাদা উন্নত ও উচ্চ হওয়া। কেউ কেউ لَتَركَبَنَّ এর অর্থ করেছেন, হে মানব সম্প্রদায়, তোমরা অবশ্যই এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হবে। যেমন শুক্র থেকে জমাটবাঁধা রক্ত পিন্ডে, অত:পর মাংসপিন্ডে, এরপর জীবিত হওয়া এবং অত:পর মৃত্যুবরণ করা এবং ধনী ও গরীব হওয়া। এখানে সম্বোধন করা হয়েছে মূলত: মানব সম্প্রদায়কে যা নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, يا أيها الإنسان إنكَ قادح الي ربك قدحا فملاقيه

"হে মানুষ, তুমি তো কঠোর শ্রমের মাধ্যমে তোমার প্রভূর দিকে ধাবিত হচ্ছ, অত:পর তার সাথে সাক্ষাৎ করবে।" (ইনশিকাক : ৬)

অপরপক্ষে আবু 'উবাইদ এবং আবু হাতিম দ্বিতীয় কিরাআতকে গ্রহণ করেছেন। তাদের মতে এখানে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চেয়ে মানুষ অর্থ নিলেই অধিকতর সাযুজ্যপূর্ণ হবে।

অন্যদিকে 'উমার শব্দটিকে لَيَركَبُنَّ 'ইয়া' বর্ণ যোগে এবং 'বা' বর্ণে পেশ দিয়ে, যা সাধারণভাবে সংবাদ মূলক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর থেকে অন্য একটি বর্ণনা এবং ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা দু'জন শব্দটিকে 'ইয়া বর্ণ যোগে এবং 'বা' বর্ণে যবর দিয়ে لَيَركَبَنَّ পড়েছেন, যার অর্থ হলো মানুষ এক স্তর থেকে অন্য স্তরে

Contents

আরোহন করবে। আরেকটি বর্ণনায় ইবন মাস'উদ ও ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা মুজারি' এর হরফ অর্থাৎ ইয়া বর্ণে যের দিয়ে পড়েছেন। কেউ কেউ মুজারি' এর হরফকে যবর এবং 'বা' বর্ণে যের দিয়ে পড়েছেন, যার দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে নফ্সকে। কারো কারো মতে আয়াতের অর্থ হলো পূর্ণতা ও ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার দিক থেকে চন্দ্রের ভিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তিত হওয়া। তবে এ মতটি অতীব দুর্বল।[১০৮]

৩. **অর্থ ও ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা ঃ** আশ্ শাওকানী তাঁর এ তাফসীরে অন্যান্য তাফসীরবিদদের **মত** অর্থের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি শব্দের বিভিন্ন অর্থ, উদ্দিষ্ট মর্ম. শব্দের মূল ধাতু, ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত, আলংকারিক প্রয়োগ প্রভৃতি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। যেমন সূরা আল ইনশিকাকের ১৭ নং আয়াত وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ "শপথ রাত্রির এবং তাতে যার সমাবেশ ঘটে।" এখানে وسق শব্দের তাফসীর করতে গিয়ে তিনি বলেন, ভাষাবিদদের মতে الوسقة শব্দের অর্থ হলো কোন বস্তুর একটিকে অন্যটির সাথে মিলিত করা। استوسقت الأبل বলা হয় তখন যখন উটগুলো একত্রিত ও মিলিত হয়। الراعي يسقها এর অর্থ হলো, রাখাল সেগুলোকে একত্রিত করল।

আল ওয়াহিদী বলেন, তাফসীরবিদগণের মতে এর অর্থ হলো একত্রিত করা, মিলিত করা, গুটিয়ে ফেলা। আর এখানে এর অর্থ হলো, দিনের বেলায় যা ছড়ানো ছিটানো ছিল তা রাত্রির আধারে একত্রিত ও সম্মিলিত করা। আর এটা এভাবে যে, যখন রাত্রির আগমন ঘটে তখন সব কিছু স্বীয় আশ্রয়স্থলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সাবী ইবনুল হারিছ আল বারজামীর কবিতাতেও শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে,

فإني و اياكم وسوقا اليكم — كقابض شيْئا لم تنله أنامله

"নি:সন্দেহে আমি এবং তোমরা তোমাদের দিকে এমনভাবে সমবেত হচ্ছি যেমন কোন বস্তুর সমবেতকারী সেগুলোকে এমনভাবে সমবেত করে যে অঙ্গুলী তার নাগাল পায় না।"

'ইকরামা বলেন, و ما وسق এর অর্থ হলো, কোন বস্তুকে তার ঠিকানা বা

আশ্রয় স্থলের দিকে পরিচালিত করা। তিনি শব্দটি দ্বারা السوق পরিচালিত করা বা পাঠিয়ে দেয়ার অর্থ গ্রহণ করেছেন, একত্রিত করার অর্থ নয়।

কেউ কেউ وما وسق এর অর্থ করেছেন و ما حسن অর্থাৎ তাতে যা কিছু সৌন্দর্য রয়েছে। কেউ কেউ আবার এর অর্থ করেছেন و ما حمل অর্থাৎ যা কিছু বহন করে।

---

১০৮. আশ্ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর (দারুল ওয়াফা লিত্ তাবা'আতি ওয়ান নাশর, ৩ সং, ২০০৫ ইং) খ. ১, পৃ. ৫৪৩-৫৪৪

আরবরা বলে, لا احمله ما وسقت عيني অর্থাৎ আমার চক্ষু যে অশ্রু বহন করেছে আমি তার ভার বহন করতে পারছি না।

কাতাদা, জাহ্হাক এবং মুকাতিল ইবন সুলায়মান (রহ.) বলেন, وما وسق এর অর্থ হলো রাত্রি যে অন্ধকার অথবা যে তারকারাজি বহন করে।

সা'ঈদ ইবন যুবাইর (রহ.) বলেন, و ما وسق এর অর্থ হলো এতে তাহাজ্জুদ, ক্ষমা প্রার্থনা প্রভৃতি যা কিছু 'আমল করা হয় তা। তবে প্রথমোক্ত মতটিই সঠিক।[১০৯]

আশ্ শাওকানী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বালাগাত বা অলংকার শাস্ত্রের আলোচনা করতেও ভুলেননি। যেমন সূরা আল বাকারার ১১ নং আয়াত انما نحن مصلحون "আমরা তো কেবলমাত্র সংশোধনকারী।" এখানে انما শব্দটি حصر বা সীমাবদ্ধকরণের শব্দ, এটি 'ইলমুল মা'আনী এর অন্তর্ভূক্ত। অনুরূপভাবে উক্ত সূরার ১৯ নং আয়াত يجعلون اصابعهم في اذانهم "তাদের আঙ্গুলসমূহ তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করায়।" এখানে اصابع শব্দটি مجاز বা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যা 'ইলমুল বাদী' এর অন্তর্ভুক্ত।

এ তাফসীরে লেখক صرف অর্থাৎ শব্দের রূপান্তর নিয়েও আলোচনা করেছেন। যেমন সূরা আল বাকারার ১৪ নং আয়াত وإذا لقوا الذين امنوا "এবং যখন তারা ঈমানদারদের সাথে মিলিত হয়।" لقوا শব্দটি মূলত: لقيوا ছিল। 'ইয়া' এর পেশটি 'কাফে' দেয়ার কারণে 'ইয়া এবং 'ওয়াও' দুটি বর্ণ পাশাপাশি সাকিন হওয়ায় 'ইয়া' বর্ণটিকে বাদ দেয়ায় শব্দটি لقوا তে রূপান্তরিত হয়েছে।

৪. **হাদীছ ও অন্যান্য বর্ণনার উদ্ধৃতি** ঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আশ্ শাওকানী বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার পাশাপাশি রিওয়ায়াত বা বর্ণিত প্রমাণাদিও উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি প্রথমত: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত হাদীছের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অত:পর সাহাবায়ে কিরামের, তৎপর তাবি'ঈগণের, তারপর তাবি' তাবি'ঈগণের এবং সর্বশেষ পরবর্তী নির্ভরযোগ্য ইমামগণের বর্ণনার উল্লেখ করেছেন।

৫. **হাদীছের সনদ বিশ্লেষণ** ঃ তিনি হাদীছের সনদ বিশ্লেষণ করে সেগুলোর শুদ্ধতা-অশুদ্ধতাও নির্ণয় করেছেন। যেমন সূরা আল বাকারার ১৯৫ নং আয়াত وأنفقوا في سبيل الله و لا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة إن الله يحب المحسنين "তোমরা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর এবং তেমাদের হাতকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করো না, আর সদাচরণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ সদাচারী ব্যক্তিদেরকে ভালবাসেন।" এ আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন, 'আব্দ ইবন হুমাইদ, আবু 'ইয়ালা, ইবন জারীর, বগবী স্বীয় মু'জামে, ইবনুল মানজুর, ইবন আবি হাতিম, ইবন হিব্বান, ইবন মানি'ঈ

---

১০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪২-৫৪৩।

এবং তাবারানী জাহ্হাক ইবন আবি জুবাইর থেকে বর্ণনা করেন, আনসারগণ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় ও দান-সাদকা করতেন। কিন্তু এক বৎসর দুর্ভিক্ষ হওয়ায় তাদের ধারণা খারাপ হয়ে গেল এবং দান করা থেকে বিরত থাকল। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন। এরপর আশ্শাওকানী বলেন, হাদীছটি 'আব্দ ইবন হুমাইদ, আবু দাউদ এবং তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এবং এটিকে সহীহ্ বলেছেন। অন্যদিকে হাদীছটি নাসাঈ, আবু 'ইয়ালা, ইবন জারীর, ইবন আবি হাতিম এবং হাকিম বর্ণনা করেছেন এবং এটিকে সহীহ্ বলেছেন।[১১০]

আবার অনেক ক্ষেত্রে তিনি পুরো সনদ উল্লেখ না করে শুধু হাদীছ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করে সাহাবী থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে আবার হাদীছ উল্লেখের পর তার শুদ্ধতা-অশুদ্ধতার ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেননি। যেমন ১ম খন্ডের ৪৫ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত হাদীছটি উল্লেখ করেছেন,

أخرج أحمد في المسند عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلي الله عليه و سلم نعوذ بالله شياطين الانس و الجن فقلت يا رسول الله وللانس شياطين؟ قال نعم

"আহমাদ স্বীয় মুসনাদে আবু যার (রাজিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমরা মানুষ ও জ্বিন শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। আমি বলরাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানুষের মধ্যেও শয়তান আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ।" এ হাদীছটি উল্লেখের পর এর শুদ্ধতা-অশুদ্ধতার ব্যাপারে তিনি কোন মন্তব্য করেননি।

৬. দুর্বল হাদীছের উদ্ধৃতি ঃ কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীছ এমনকি কতিপয় জাল হাদীছও তাঁর তাফসীরে স্থান পেয়েছে। নিম্নে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :

ক. যেমন সূরা আল মায়িদার ৫৫ নং আয়াত إنما وليكم الله و رسوله و الذين أمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكاة و هم راكعون

"নিঃসন্দেহে তোমাদের অভিভাবক হলেন আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ঐ সকল মুমিন, যারা সালাত কায়িম করে, যাকাত আদায় করে এবং রুকুকারী বা বিনম্র।"

এ আয়াতের তাফসীরে তিনি এমন একটি জাল হাদীছ উদ্ধৃত করেছেন, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যুর পর 'আলী (রা.) এর খিলাফাতের ব্যাপারে শি'আ সম্প্রদায়ের লোকেরা বানিয়েছে। সেটি হলো, 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা.)

---

১১০. আশ্ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর (দারুল ওয়াফা লিত্ তাবা'আতি ওয়ান নাশর, ৩ সং, ২০০৫ ইং) খ. ১, পৃ. ৩৫০।

বর্ণনা করেন, 'আলী (রা.) রুকূ অবস্থায় একটি সাদকা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাওয়ালকারীকে প্রশ্ন করলেন, তোমাকে এ আংটি কে দিয়েছে? সে উত্তর দিল, ঐ রুকুকারী ব্যক্তি। তখন আল্লাহ উরোক্ত আয়াত নাযিল করলেন।[১১১]

খ. সূরা আল মায়িদার ৬৭ নং আয়াত يأيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهد القوم الكافرين

"হে রাসূল, তোমার প্রভুর পক্ষ হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা পৌঁছিয়ে দাও। আর যদি তা না কর, তাহলে তার পয়গাম পৌছানো হলোনা। আল্লাহই তোমাকে মানুষের (অনিষ্ট) হতে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।" এ আয়াতের পটভূমিকায় যে বর্ণনাটি উল্লেখ করা হয়েছে, সেটিও একটি বানোয়াট বা জাল হাদীছ। সেটি হলো, "আবু সা'ঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, উক্ত আয়াতটি 'আলী ইবন আবি তালিবের খিলাফাতের ব্যাপারে গাদীরে খুম এর দিন নাযিল হয়েছে।[১১২]

এ সকল জ'ঈফ ও জাল বর্ণনার ব্যাপারে তিনি কোন মন্তব্য করেননি। অবশ্য এর ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছেন। এ তাফসীরের ভূমিকায় তিনি বলেছেন,

و قد أذكر ما في إ سناده ضعف إما لأن في المقام ما يقويه أو لموافقته للمعني العربي و قد اذكر الحديث معزوا إلي راويه من غير حال الإسناد لأني أجده في الاصول التي نقلت عنها كذلك

"অবশ্য আমি দুর্বল সনদের কিছু বর্ণনাও উল্লেখ করেছি। কারণ সেটি হয়ত উল্লেখিত স্থানের তাফসীরকে সুদৃঢ় করেছে অথবা তা 'আরবী শব্দের অর্থের অনুকূল হয়েছে। আমি কিছু হাদীছ সনদের অবস্থা পর্যালোচনা ছাড়াই শুধু বর্ণনাকারীর সাথে সম্পর্কিত করে বর্ণনা করেছি। কারণ যে মূল তাফসীর থেকে তা আমি বর্ণনা করেছি, সেখানে সেগুলোকে এভাবেই পেয়েছি। যেমন ইবন জারীর, কুরতুবী, ইবন কাছীর, সুয়ূতী প্রমুখের তাফসীরে রয়েছে।"[১১৩]

কিন্তু তাঁর মত খ্যাতিমান তাফসীরবিদের জন্য এটি অবশ্যই একটি দুর্বল দিক। এসকল বর্ণনা যে জাল ও দুর্বল তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা উচিৎ ছিল। অথবা এ জাল বর্ণনাগুলো বর্জন করা উচিৎ ছিল।

৭. ফিকহী মাসয়ালা আলোচনা ঃ আহকাম সংক্রান্ত আয়াতসমূহের তাফসীর করতে

---

১১১. আশ্ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, খ. ২, পৃ. ৪৮।
১১২. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫০।
১১৩. গুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩০-১৩১।

গিয়ে তিনি সেগুলোর মাসয়ালা মাসায়িল এর বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন। আয়াত থেকে হুকুম বর্ণনা করার পর সে বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ উল্লেখ করেছেন এবং তাঁদের মতের স্বপক্ষে কী কী দলীল রয়েছে সেগুলোও উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি নিজস্ব মতের ভিত্তিতে যেটিকে সঠিক মনে করেছেন সেটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যেহেতু তিনি মুজতাহিদ ছিলেন সেহেতু নিজেই চিন্তা-গবেষণা করে হুকুম চয়ন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোন একটিকে প্রাধান্য দিতে সক্ষম ছিলেন।

৮. **দ্বন্দ্ব নিরসন ঃ** যে সকল ক্ষেত্রে বিপরীতমুখী তাফসীর বা ব্যাখ্যা রয়েছে, সে সকল ক্ষেত্রে আশ্ শাওকানী যৌক্তিকভাবে তার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি যথাসম্ভব বৈপরিত্য দূর করে সঠিক দিকটি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।

৯. **ভ্রান্ত মত ও ভুল ব্যাখ্যার জবাব দান ঃ** যে সকল ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদের অধিকারীরা কুরআনের অপব্যাখ্যা করে তাদের ভ্রান্ত চিন্তার পক্ষে কুরআনকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করার চেষ্টা করেছেন - বিশেষ করে মুতাযিলা সম্প্রদায় - সেগুলো তিনি উল্লেখ করেছেন এবং সঠিক ব্যাখ্যা ও যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে সেগুলোর ভ্রান্তি তুলে ধরে জবাব দিয়েছেন ও সঠিক মত কোনটি তা প্রমাণ করেছেন।

মোট কথা এটি এমন এক তাফসীর গ্রন্থ যেখানে প্রায় সকল বিষয়ের সমাহার ঘটেছে। ফলে এটি অনন্য ও চমৎকার একটি তাফসীরের রূপ লাভ করেছে।

২. **নাইলুল আওতার :** এ গ্রন্থটি 'আল্লামা আশ্ শাওকানীর এক অনন্য সৃষ্টি। গ্রন্থটির পূর্ণ নাম "নাইলুল আওতার শারহি মুন্তাকাল আখবার মিন আহাদীছি সায়্যিদিল আখইয়ার"। নয় খন্ডে প্রকাশিত এটি এক বিশাল গ্রন্থ। এটি মূলত: শরাহ্ বা ভাষ্য গ্রন্থ। মূল গ্রন্থের নাম হলো "মুন্তাকাল আখবার মিন আহাদীছি সায়্যিদিল আখইয়ার"। এটি মূলত: হাদীছ শাস্ত্রের একটি সংকলন। মূল গ্রন্থ মুন্তাকার লেখক হলেন শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়ার দাদা আবুল বারাকাত মাজদুদ্দীন 'আব্দুস সালাম ইবন 'আব্দুল্লাহ ইবন আবিল কাসিম ইবন মুহাম্মাদ, যার জন্ম ৫৯০ হিজরীর কাছাকাছি।[১১৪]

নাইলুল আওতার গ্রন্থে লেখক 'আল্লামা আশ্ শাওকানী হাদীছের আলোকে শারী'আর বিধানাবলী সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটি বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিভক্ত। গ্রন্থটি অত্যন্ত সুবিন্যস্ত ও চমৎকার অনুক্রমিক ধারায় সজ্জিত। এ গ্রন্থের ভাষা সহজ-সরল, সাবলীল ও প্রাঞ্জল। সাহিত্য বিচারে এটি অত্যন্ত উঁচুমানের গ্রন্থ। গ্রন্থটি 'আল্লামা আশ্ শাওকানীর হাদীছ ও আহকামে শারী'আর গভীর জ্ঞান, অগাধ পান্ডিত্য ও শারী'আর আহকাম চয়নে সূক্ষ্মদর্শিতা ও বিচক্ষণতার প্রমাণ বহন করে।

---

১১৪. আশ্ শাওকানী, নাইলুল আওতার খ. ১, পৃ. ১৭।

গ্রন্থটি প্রাচীন হলেও আধুনিক যুগের গ্রন্থের ন্যায় রেফারেন্স বা তথ্যসূত্র সমৃদ্ধ। এটি অধ্যয়নে বিষয় ভিত্তিক প্রায় সকল হাদীছের সাথে পরিচিত হওয়া যায়। গ্রন্থটিতে 'আল্লামা আশ্ শাওকানী আলোচনার যে রীতি অবলম্বন করেছেন, তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. **মূল গ্রন্থের হাদীছ উল্লেখ :** এ গ্রন্থে লেখক সর্বপ্রথম মূল গ্রন্থে বর্ণিত হাদীছ (একটি বা একসাথে একাধিক) উদ্ধৃত করেছেন। অত:পর হাদীছটি বা হাদীছগুলো কোন্ গ্রন্থে কিভাবে কোন্ কোন্ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তার বর্ণনা দিয়েছেন। কোন্ গ্রন্থে পরিবর্তিত কোন্ শব্দে বা বাক্যাংশে বর্ণিত হয়েছে, তাও তিনি উল্লেখ করেছেন।

২. **সনদ পর্যালোচনা :** হাদীছের সনদ বা সূত্র পরম্পরা পর্যালোচনা করে লেখক বর্ণনাকারীদের অবস্থা নির্ণয় করেছেন। কোন্ রাবী বা বর্ণনাকারী দুর্বল, কোন্ রাবী নির্ভরযোগ্য তা চিহ্নিত করেছেন এবং দুর্বল বা নির্ভরযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের মতামত কী তাও উল্লেখ করেছেন।

৩. **শব্দ বিশ্লেষণ :** প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ বিশেষ শব্দ ও বাক্যাংশের বিশ্লেষণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি

ক. শব্দস্থিত বিভিন্ন বর্ণের হরকত (স্বরচিহ্ন) কী হবে তা বর্ণনা করে শব্দের সঠিক উচ্চারণ নির্ণয় করেছেন। সংশ্লিষ্ট শব্দের ব্যাপারে ভাষাবিদদের বিভিন্ন মতামতও তিনি তুলে ধরেছেন।

খ. শব্দটি কোন্ শব্দমূল বা ধাতু হতে নিষ্পন্ন হয়েছে এবং কিভাবে তার রূপান্তর হয়েছে, তা পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন।

গ. ক্ষেত্র বিশেষে শব্দটির ব্যাকরণগত অবস্থান কী, তা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।

ঘ. শব্দের অর্থ ও উদ্দেশ্য কী তাও বর্ণনা করেছেন। শব্দটি কী কী অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং বর্ণিত ক্ষেত্রে এর প্রযোজ্য অর্থ কী, মর্মার্থ বা উদ্দিষ্ট অর্থ কী প্রভৃতি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। শব্দটির প্রয়োগ, অর্থ বা গৃহীত উদ্দেশ্যের ব্যাপারে ভাষাবিদ ও হাদীছ বিশারদদের যে সকল মতামত রয়েছে, তিনি সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

ঙ. কোন অর্থটি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সঠিক এবং এর প্রকৃত উদ্দেশ্য কী, সেটি উল্লেখ করেছেন ও তার স্বপক্ষে কুরআন-সুন্নাহ্র বিভিন্ন প্রায়োগিক প্রমাণ উপস্থাপন করে তা সুদৃঢ় করেছেন। মোট কথা ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও শব্দ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি হাদীছ ও তার বিভিন্ন শব্দকে পাঠকদের নিকট সহজবোধ্য করে পেশ করেছেন।

যেমন এর ৪র্থ খন্ডের ২০১ ও ২০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে :

عن جابر عن النبي صلي الله عليه و سلم قال فيما سقت الانهار والغيم العشور وفيما سقي السانية نصف العشور– رواه احمد ومسلم و النسائ و ابو داؤد و قال الانهار و العيون

জাবির (রা.) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নদী এবং বৃষ্টি যে ভূমিতে পানি সিঞ্চন করে তাতে 'উশর (এক দশমাংশ) এবং কূপ হতে উটের সাহায্যে যাতে পানি সিঞ্চন করা হয় তাতে 'উশরের অর্ধেক অর্থাৎ বিশ ভাগের একভাগ যাকাত আবশ্যক হয়। (আহমাদ, মুসলিম, নাসাঈ, আবু দাউদ এ হাদীছটি বর্ণনা করেন। আবু দাউদ বলেন, নদী এবং ঝর্ণাসমূহ অর্থাৎ তিনি নদী ও খালের পরিবর্তে নদী ও ঝর্ণার কথা উল্লেখ করেছেন।

عن ابن عمر ان النبي صلي الله عليه و سلم قال فيما سقت السماء و العيون او كان عثريا العشر و فيما سقي بالنضح نصف العشر– رواه الجماعة الا مسلما لكن لفظ النسائ و ابي داؤد و ابن ماجة بعلا بدل عثريا

ইবন 'উমর (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে জমিতে আকাশ ও ঝর্ণা পানি সিঞ্চন করে অথবা যদি তা এমন ভূমি হয় যাতে প্রাকৃতিকভাবে পানির ব্যবস্থা হয়ে থাকে, তাতে এক দশমাংশ এবং যে জমিতে সেচ দিয়ে পানি দিতে হয় তাতে এক দশমাংশের অর্ধেক (যাকাত) আবশ্যক হয়। মুসলিম ব্যতীত সিহাহ্ সিত্তার অন্যান্যরা এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে নাসাঈ, আবু দাউদ ও ইবন মাজাহ্তে عثريا শব্দের পরিবর্তে بعلا শব্দ রয়েছে।

উপর্যুক্ত হাদীছ দু'টি উল্লেখের পর আশ্ শওকানী নিম্নোক্তভাবে এ গুলোর ভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনা করেছেন:

الغيم শব্দটি 'গাইন' বর্ণে যবর দিয়ে হবে। এর অর্থ হলো বৃষ্টি। অন্য বর্ণনায় রয়েছে الغيل 'লাম বর্ণ যোগে। আবু উবায়দা বলেন, এর অর্থ কোন বড় স্রোতস্বিনী নয় বরং এমন ছোট স্রোতস্বিনী, যা পানি বহন করে নদীতে নিয়ে যায়। ইবন সাকিত বলেন, এর অর্থ হলো ভূমির উপর প্রবাহিত পানি।

العشور শব্দটির ব্যাপারে 'আল্লামা নববী বলেন, শব্দটি 'আইন' বর্ণের উপর পেশ হবে। এটি عشر শব্দের বহুবচন। কাজী 'ইয়াজ বলেন, আমাদের সাধারণ শায়খদের মতে শব্দটি 'আইন বর্ণে যবর হবে। মাতালি' গ্রন্থের লেখক বলেন, অধিকাংশ শায়খের মতে শব্দটি 'আইন বর্ণে পেশ দিয়ে হবে। ইমাম নববী বলেন, এটি সঠিক হওয়ার যে দাবী করা হয় তা ঠিক নয়। কারণ এটি স্বীকৃত যে, অধিকাংশ বর্ণনাকারী শব্দটি 'আইন বর্ণে

পেশ দিয়ে বর্ণনা করেছেন, যা হলো عشر শব্দের বহুবচন। عشر اهل الذمة বাক্যাংশে 'আইন বর্ণে পেশ হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। এ দু'টি শব্দের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই বিধায় এখানেও শব্দটি 'আইন বর্ণে পেশ দিয়ে পড়াই সঠিক।

السانية শব্দের অর্থ হলো সেই উট, যার দ্বারা কূপ হতে পানি নেয়া হয়। একে সিঞ্চনকারীও বলা হয়। سنوا – يسنوا – سنا বলা হয় যখন তার সাহায্যে পানি পরিবেশন করা হয়।

فيما سقت السماء এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে বৃষ্টি, বরফ, শিলা, হালকা বৃষ্টি বা শিশিরকে। العيون শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে সেই প্রবাহিত নদী বা ঝর্ণাকে যা থেকে সেচ যন্ত্র ব্যবহার ছাড়াই পানি প্রবাহিত করা যায়।

او كان عثريا বাক্যের عثريا শব্দটি 'আইন' ও 'ছা' বর্ণে যবর, 'রা' বর্ণে যার ও 'ইয়া' বর্ণে তাশদীদ হবে। ইবনুল 'আরাবী বলেন, শব্দটির 'ছা' বর্ণে তাশদীদ হবে। কিন্তু ছা'লাব এ মতটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইমাম খাত্তাবী বলেন, চুয়ে চূয়ে পানি এসে যে জমিকে সিক্ত করে - কোন সেচের প্রয়োজন হয়না, তাকে عثري বলা হয়।

ইবন কুদামা কাজী আবু 'ইয়ালা থেকে বর্ণনা করেন, এটি হলো ডোবা বা জলাশয়ে বৃষ্টির পানি জমে তা থেকে স্বাভাবিকভাবে পার্শ্ববর্তি যে সকল ভূমিকে সিক্ত করে বা সিঞ্চন করে। তিনি বলেন, শব্দটি العاثور শব্দ থেকে নিষ্পন্ন। এটা হলো এমন নালা বা খাল যাতে পানি প্রবাহিত হয় অথবা অনুরূপ কোন নালা বা ড্রেন যা কোন চেষ্টা ছাড়াই নদী থেকে পানি পরিবেশন করে অথবা চূয়ে চূয়ে পারি পরিবেশন করে। যেমন এমন কোন জমিতে বৃক্ষরোপন বা শস্য বপন করা, যার সন্নিকটে পানি রয়েছে, যাতে গাছের শিকড় তাতে পৌঁছে পানি শোষণ করে ফলে আর সেচ দেয়ার প্রয়োজন হয় না।

بالنضح শব্দটি 'নূন' বর্ণে যবর, জ্বাদ বর্ণে সাকিন, যার পরে রয়েছে 'হা' বর্ণ। এর অর্থ হলো সেচের দ্বারা। بعلا শব্দটি 'বা' বর্ণে যবর, 'আইন' বর্ণে সাকিন। 'আইন বর্ণে পেশ দিয়ে পড়ার বর্ণনাও রয়েছে। কামূস অভিধানে বলা হয়েছে, البعل হলো সে উঁচু ভূমি, যাতে বছরের এক সময় বৃষ্টি হয় এবং প্রত্যেক ঐ খেজুর বৃক্ষ এবং শস্য ক্ষেত যাতে পানি সেচতে হয়না অথবা যাতে পানি সিঞ্চন করে থাকে বৃষ্টি। কেউ কেউ বলেন, তা হলো ঐ সকল বৃক্ষ, যা শিকড়ের সাহায্যে ভূমি হতে পানি শোষণ করে।

হাদীছ দু'টি প্রমাণ করে যে, বৃষ্টি ঝর্ণা বা অনুরূপ কোন পন্থায় কোন শ্রম বা ব্যয় ব্যতীত স্বাভাবিকভাবে যাতে পানি সিঞ্চিত হয়, তাতে 'উশর (এক দশমাংশ) এবং সেচ বা অন্য কোনভাবে যাতে পানি সরবরাহ করা হয়, যাতে শ্রম ও অর্থ ব্যয় হয়, তাতে 'নিসফুল 'উশর' অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত প্রদান ওয়াজিব হয়। ইমাম নববী (রহ.) বলেন, এর উপর সকলের ঐকমত্য রয়েছে।

তবে যদি ভূমিটি এমন হয়, যাতে কখনো পানি সেচ দিতে হয় আবার কখনো বৃষ্টির দ্বারা (বা ঝর্ণার দ্বারা) পানি পরিবেশিত হয়, তাহলে সেখানে বিশেষজ্ঞগণের মতে 'উশরের তিন চতুর্থাংশ অর্থাৎ পনের ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব হবে। ইবন কুদামা বলেন, এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। কিন্তু পানি সেচের উপরোক্ত দু'টি পন্থা সমান না হয়ে যদি কোন একটি বেশি হয়, তাহলে ইমাম আহমাদ, ইমাম আছ্ ছাওরী, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) এর এক মতানুযায়ী যেটির ব্যবহার বেশি হয়েছে, সেটির হুকুম-ই প্রযোজ্য হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, এক্ষেত্রে উভয় সেচকে গড় করে অংশানুপাতে যাকাত গৃহীত হবে। হাফিয বলেন, যদি প্রতিটির অংশ আলাদা করা সম্ভব হয়, তাহলে হিসাব করে অংশানুপাতে যাকাত গ্রহণ করতে হবে।[১১৫]

৪. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যান্য হাদীছ উপস্থাপন : 'আল্লামা আশ্ শাওকানী এ গ্রন্থে মূল হাদীছ উল্লেখের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যান্য আরো অনেক হাদীছ একত্রিত করেছেন। ফলে পাঠকবর্গ এক সাথে একই বিষয়ের অনেক হাদীছের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করতে পারেন।

৫. হাদীছের হুকুম নির্ণয় : এ গ্রন্থে লেখক হাদীছ থেকে কী কী হুকুম নির্ধারিত হয় তারও বিবরণ দিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট হুকুমের ব্যাপারে ইমাম ও মুহাদ্দিছগণের

বিভিন্ন অভিমত এবং অভিমতসমূহের স্বপক্ষে কী কী দলীল রয়েছে, তারও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। দলীলগুলো পর্যালোচনান্তে কোন্ অভিমতটি সঠিক এবং সঠিক হওয়ার কারণ কী তাও উল্লেখ করেছেন। নাইলুল আওতার মূলত: একটি হাদীছ গ্রন্থ। কিন্তু লেখক এটিকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, শারী'আর সঠিক আহকাম জানার ক্ষেত্রে এটি একটি নির্ভুল উৎসে পরিণত হয়েছে।

'আল্লামা আশ্ শাওকানীর সাহিত্য ও কাব্য প্রতিভা

'আল্লামা আশ্ শাওকানীর সাহিত্য ও কাব্য প্রতিভাও ছিল উল্লেখযোগ্য। আনুষ্ঠানিক পড়ালেখার শুরুতেই তিনি ইতিহাস অধ্যয়ন ও সাহিত্য সভায় যোগদানে মশগুল হয়ে পড়েন।[১১৬] তিনি নাহু, সরফ, অলংকার শাস্ত্র, ছন্দ প্রকরণ বিদ্যা প্রভৃতি গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেন।[১১৭] সে সময়ের ভাষাবিদ পন্ডিতদেয় নিকট হতে ভাষা, সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলংকার শাস্ত্র, ছন্দ প্রকরণ বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা করে সাহিত্য ও কাব্য ক্ষেত্রে তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।[১১৮] ফলে তিনি বিশুদ্ধ ভাষা ও অলংকারপূর্ণ

---

১১৫. আশ্ শাওকানী, নাইলুল আওতার, খ. ৪, পৃ. ২০১-২০২।
১১৬. আশ্ শাওকানী, নাইলুন আওতার, খ. ১, ভূমিকা, পৃ. ȷ।
১১৭. আশ্ শাওকানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯-২২৩।
১১৮. আশ্ শাওকানী ,আল্ বাদরুত তালি', . খ. ২, পৃ. ২১৯।

সাহিত্য কীর্তির অধিকারী হন। তিনি আলংকারিক, শৈল্পিক, সাবলীল ও ছন্দময় গদ্য রচনায় যেমন পারদর্শী ছিলেন, তেমনি কাব্য রচনায়ও ছিলেন সুদক্ষ। তিনি অনায়াসেই সল্পতম সময়ের মধ্যে বড় বড় কবিতা রচনা করতে পারতেন।[১১৯] আশ্ শাওকানীর কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে তাঁর অন্যতম শিক্ষক 'আলী ইবন ইবরাহীম (১১৩৯ - ১২০৭ হি.) বলেন, "তিনি কবিতা ও কাসীদা রচনায় খুবই পারদর্শী ছিলেন। আর তিনি কবিতার আলোকে কথাও বলতে পারতেন।[১২০] অতি দ্রুততার সাথে তাঁর কাসীদা ও ছন্দ কবিতা রচনায় লোকেরা মুগ্ধ হয়ে যেতেন এবং তাঁর প্রসংশায় পঞ্চমুখ হতেন। আলংকারিক বিচারে তাঁর কবিতা ছিল অতুলনীয়।[১২১]

তাঁর রচিত বিভিন্ন কবিতার অংশ বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :

১. اذ ا كان هذا الدمع يجرى صبابه ـــ على غير ليلى فهو دمع مضيع

وكيف ترى ليلى بعين تري بها ـــ سواها وما طهرتها با لمدامع

ويلتذ منها بالحديث وقد جرى ـــ حديث سواها خروت المسامع

অনুবাদ : এ অশ্রু যখন লাইলী ব্যতীত অন্য কারো প্রেমের টানে প্রবাহিত হয়, তখন তা হয় বৃথা অশ্রুক্ষরণ।

সে চোখ দিয়ে তুমি কিভাবে লাইলীকে দেখতে পাবে, যে চোখ দিয়ে তুমি অন্যকে দেখ এবং যা অশ্রু বিধৌত হয়ে পবিত্র হয়নি?

কর্ণকুহরে অন্যের কথা প্রবাহমান রেখে সে কী করে তার (লাইলীর) কথার দ্বারা স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে?

২. الا ان وادى الجزع اضحى ترابه ـــ من المس كا فورا واعواده زبدا

وما ذ لك الا ان هذا عشية ـــ تمشت وجرت فى جوانبه بردا

ওহে! নিশ্চয়ই তার সংস্পর্শে এ উপদ্বীপের মাটি হয়েছে সৌরভদীপ্ত আর এর শাখা-প্রশাখাগুলো পরিণত হয়েছে মাখনে। এটা এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, এই সন্ধ্যা ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে এবং তার চারদিকে শৈত্য প্রবাহিত করে চলছে।

৩. انا راض بما قضى ـــ واقف تحت حكمه

---

১১৯. জালালউদ্দিন প্রাগুক্ত পৃ. ২৫।
১২০. জালাল উদ্দিন প্রাগুক্ত. পৃ. ২৬-২৭।
১২১. প্রাগুক্ত পৃ.২৫।

سا ئل ان افوز بالخير ـــ ومن حسن ختمه

অনুবাদ : আমি তাঁর (আল্লাহর) ফায়সালায় সন্তুষ্ট এবং তাঁর হুকুমের অধীনে অবস্থানরত। আমি কল্যাণের দ্বারা সাফল্যমণ্ডিত হতে ও তাঁর সুন্দর সমাপ্তির প্রত্যাশী।

٤. العفو يرجى من بني ادم - فكيف لا يرجى من الرب

فانه أرأف بي منهم ـــ حسبي به حسي به حسبي[١٢٢]

অনুবাদ : মানুষের কাছেই ক্ষমা প্রত্যাশা করা হয়, তাহলে রবের কাছে তা প্রত্যাশা করা হবেনা কেন? কারণ তিনি তো আমার প্রতি তাদের চেয়ে অনেক বেশি স্নেহপরায়ণ। তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট।

'আল্লামা আশ্ শাওকানী মাঝে মধ্যে কবিতার মাধ্যমে তাঁর শিক্ষক ও অন্যান্যদের নিকট পত্র বিনিময় করতেন। তাঁর নিকট কেউ কবিতার মাধ্যমে পত্র দিলে তিনি কবিতার মাধ্যমেই তার জবাব দিতেন। তাঁর অন্যতম ছাত্র লুৎফুল্লাহ ইবন আহমাদ তাঁর নিকট কাসীদা লিখে পাঠালে তিনি তার উত্তরে নিম্নোক্ত কাসীদাটি লিখে পাঠান।

اتي منك يا فخر الاوان و زينة الزمان — نظام دونه الجوهر الفرد

كما الدر لا بل كالدراري بل غدا - كبدر السماء لا بل هو الشمس اذ تبدو

و ما ذا عسي من لم يكن رب نصفه — يقول و هل في مثل ذا يحسن الجحد

و خر شمس الافق و هي منيرة — اذا ضعفت عن نورها الا عين الرمد

و ما ذا علي البحر الخضم لدي الوري — اذا بال في احدي جوانيه الفرد

و ما عيب بيضاء الترائب في الدني - اذا عافها ذو عفة ما له جهد

و من قال هذا الشهد مر فقل له - مرارة فيك المر مر بها الشهد

و ان فاله هذا السيف ليس بقاطع - فقل حده ما بيننا الفصل و الحد

مناقب لطف الله جلت فمن غدا - يرددها جهلا بها بطل الرد

فتي قد ورتي في مدرج العز و ارتدي - بثوب الهدي و انقاد طوعا له المجد

و سيوّدده كل باب من العلي - برغم اعاديه هو السوّدد و العد[١٢٣]

---

১২২. কবিতাগুলোর জন্য দ্র. আশ্ শাওকানী. আল বদরুন তালি', খ. ২, পৃ. ২২৫।

১২৩. জালাল উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

অনুবাদ : হে সময়ের অহংকার ও যুগের শোভা, আমি তোমার নিকট হতে এমন কাব্যগাথা পেয়েছি, যার সামনে অনন্য জওহরও (মনিরত্ন) তুচ্ছ।

যেন তা মুক্তাখন্ড, না, যেন তা মুক্তার মাল্য বরং তা যেন আকাশের পূর্ণ চন্দ্র, না, না বরং যেন তা বিকাশমান সূর্য।

ন্যায়বোধবিহীন সে ব্যক্তির নিকট কি আশা করা যায়, যে বলে, এ ধরনের অকৃতজ্ঞতার প্রতি কি সদাচার করা যায়।

আর আকাশের উজ্জ্বল রবি যেন ভূমিতে নেমে এসেছে, যার দীপ্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, যা অসুস্থ চক্ষু ব্যতীত সবাই প্রত্যক্ষ করে।

পৃথিবীর সন্নিকটে কোন এক সাগরতীরে যদি কেউ মূত্র ত্যাগ করে, তাহলে বিশাল সাগরের তাতে কি আসে যায়?

যিনি স্বীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টায় জগতে সমকক্ষদের মধ্যে সমুজ্জল মর্যাদার অধিকারী, তাকে অপছন্দকারীরা যদি অপছন্দ করে তাতে কি ক্ষতি?

যে ব্যক্তি বলে এ মধু তিক্ত, তাকে বল, (মধু তিক্ত নয়, বরং) তোমার মধ্যে অবস্থিত তিক্ততার দ্বারাই মধু তিক্ত হয়ে গিয়েছে।

যদি তাকে বলা হয়, এ তলোয়ার ধারালো নয় তাহলে তুমি বল, তীক্ষ্ণতা ও আমাদের মাঝে একটি পরিসীমা নির্ধারণ করে দাও।

লুৎফুল্লাহর মর্যাদা সমুজ্জল হয়েছে, আগামী দিনে কেউ মূর্খতাবশত: তা প্রত্যাখ্যান করলে সেটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

তিনি এমন যুবক, যিনি মর্যাদার সিঁড়িতে পদচিহ্ন এঁকে দিয়েছের এবং সঠিক পথের পোশাক পরিধান করেছেন।

আর সন্মান তার নিকট স্বেচ্ছায় অনুগত হয়েছে।

তাঁর মর্যাদার প্রতিটি দরজাই সুউচ্চ, বৈরিতা সত্ত্বেও তিনি মর্যাদা ও বিশিষ্টতার অধিকারী।

আশ্ শাওকানী তাঁর শিক্ষক 'আল্লামা আল কাসিম ইবন ইয়াহ্ইয়া আল খাওলানীর নিকট কয়েকটি কিতাব পাঠ করতে চেয়ে যে কাব্য পত্র লিখেছিলেন, তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

عز دين الاله حافظ علم الال — ال النبي خير البرية

و جمع العلوم فرعا و اصلا – و لسانا لديه غير خفية

انت فخر الزمان زينة اهله – جمال العلا و كريم السجية

و لك النثر و النظام الذي قد – صفته من كواكب درية

كل من يدعي صفاتك في العلم – فامنيه له اشعبيه

قد طلبتم مني انجار وعد – ان هذا لدي عكس القصية

فحقيق ان اكون انا الطالب – منك الافادة الاكملية

بل حدير لمن تصدر مثلي – و هو في رتبة القصور الدنية

ان يقوم العزيز خير مقر – بمعان بفكره لوذيعه

زادك الله في المعاني صعودا – بكرة في مسرة و عشيه"[١٢٤]

অনুবাদ : "আল্লাহর দ্বীনের সম্মান বৃদ্ধিকারী, সৃষ্টির সেরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জ্ঞানের সংরক্ষক। তিনি মৌলিক ও শাখা-প্রশাখাসহ জ্ঞানসমূহকে একত্রিত করেছেন এবং তাঁর ভাষা অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

আপনি যুগের অহংকার এবং তার অধিবাসীদের অলংকার; উচ্চ শ্রেণীর সৌন্দর্য ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী। আপনার রয়েছে গদ্য ও কবিতা, যার বৈশিষ্ট উজ্জ্বল তারকা সদৃশ।

যে ব্যক্তি আপনার জ্ঞানের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হওয়ার দাবী করে আমি তাকে তুচ্ছ জ্ঞানে ভর্ৎসনা করি।

আপনি আমার নিকট অঙ্গীকার পূরণের আশা করেছেন, নি:সন্দেহে এটা আমার জন্য কোন সুদূর পরাহত ব্যাপার নয়।

প্রকৃতপক্ষে আমি আপনার নিকট থেকে পরিপূর্ণ উপকার অন্বেষী হতে চাই।

যে ব্যক্তি ত্রুটি-বিচ্যুতিতে ভরপুর এবং ভীরু হৃদয়ের অধিকারী অথচ আমার মত আগ্রহী, তার জন্য মানানসই হলো এরূপ সম্মানী ব্যক্তির উত্তম স্থানে দন্ডায়মান হওয়া, যার অবস্থান খনি সদৃশ।

আল্লাহ আপনার উচ্চাসন ও উচ্চ মর্যাদার সর্বদা উন্নতি দান করুণ।"

'আল্লামা আশ্ শাওকানী দু'টি কাব্য গ্রন্থও রচনা করেছেন। তার একটির নাম হলো 'বুগিয়াতুল আরীব মিম মা'আনিল লাবীব' এবং অন্যটির নাম হলো 'কিফায়াতুল মুহতাজ'।[১২৫]

এ গ্রন্থ দু'টিতে তিনি তাঁর নিজের লেখা কবিতা এবং বিভিন্ন সময়ে তাঁর নিকট যাঁরা কবিতা লিখে পাঠিয়েছেন, সেগুলোকে একত্রিত করেছেন।[১২৬]

এ আলোচনা থেকে 'আল্লামা আশ্ শাওকানীর কাব্য প্রতিভা এবং সাহিত্য জগতে তাঁর সরব পদচারণার প্রমাণ পাওয়া যায়।

---

১২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।
১২৫. প্রাগুক্ত।
১২৬. প্রাগুক্ত।

বিচারকের দায়িত্ব পালন

জ্ঞানের প্রতি অতি মাত্রায় আসক্তির কারণে 'আল্লামা আশ্ শাওকানী দুনিয়ার প্রতি ছিলেন নিরাসক্ত। ফলে তিনি রাষ্ট্রীয় কার্য, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব বা দুনিয়াদার ব্যক্তিবর্গের সংসর্গে আসার সুযোগ পাননি। কিন্তু এক পর্যায়ে তিনি রাষ্ট্রীয় কর্ম কান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে বাধ্য হন।

পূর্ববর্তী বিচারক কাজী ইয়াহইয়া ইবন সালিহ্ আশ্ শাজারীর মৃত্যুর পর 'আল্লামা আশ্ শাওকানীকে সান'আর প্রধান বিচারকের পদে সমাসীন করা হয়। তাঁর বয়স যখন ৩০ এবং ৪০ এর মাঝামাঝি তখন তিনি বিচারক পদে নিয়োজিত হন।[১২৭] বিচারক নিযুক্ত হওয়ার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে তিনি বলেন, "এ সময় আমি লোকদের থেকে, বিশেষত: নেতৃস্থানীয় ও শাসকদের থেকে দূরে অবস্থান করে গবেষণাকর্ম, ফাতওয়াদান ও গ্রন্থ রচনায় মশগুল ছিলাম। আমি তাদের কারো সঙ্গে মিলিত হতাম না - সে যেই হোক না কেন। কিন্তু কাজী ইয়াহইয়া ইবন সালিহ আশ্ শাজারীর মৃত্যুর পর এক সপ্তাহের মধ্যে যখন আমাকে বিচারকের দায়িত্ব পালনের জন্য তলব করা হলো, তখন আমি বিষয়টি আঁচ করতে পারলাম। আমি দীর্ঘদিন পর্যন্ত এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে চললাম। কিন্তু এক পর্যায়ে বড় বড় 'উলামায়ে কিরাম ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আমাকে খুব পীড়াপীড়ি করতে লাগল এবং তারা একমত হলো যে, এ প্রস্তাব গ্রহণ করা আবশ্যক। কারণ তারা আশংকা করল যে, আমি যদি এ পদ গ্রহণ না করি তাহলে এমন কেউ এ পদে আসীন হবে, যার দ্বীনদারী ও জ্ঞানের ব্যাপারে আস্থা রাখা যাবেনা। শেষাবধি আমি আল্লাহর সাহায্য চেয়ে ও তাঁর উপর ভরসা করে এ পদ গ্রহণ করলাম।"[১২৮]

বিচারক নিযুক্তির পর হতে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এ পদে কর্মরত ছিলেন।[১২৯] জ্ঞান চর্চার প্রতি আশ্ শাওকানীর এতটাই ঝোঁক ছিল যে, বিচারকের মত ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন সত্ত্বেও তিনি জ্ঞান চর্চা পরিহার করেন নি।[১৩০]

ইসলামের দা'ওয়াত সম্প্রসারণ

অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, গবেষণা, গ্রন্থ রচনা, বিচার কার্য পরিচালনা প্রভৃতি নানাবিধ ব্যস্ততা সত্ত্বেও 'আল্লামা আশ্ শাওকানী দা'ওয়াতী দায়িত্বের কথা বিস্মৃত হননি। বরং তিনি এর

---

১২৭. আশ্ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, খ. ১, পৃ. ২৩।

১২৮. আশ্ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর (মিশর : দারুল ওয়াফা, ৩য় সং, ২০০৫ ইং) খ. ১, পৃ. ২৬।

১২৯. আশ্ শাওকানী, আল্ বাদরুত তালি', খ. ২, পৃ. ২২৪; জালাল উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২১। বার্ণাড হেইকেলের মতে আশ্ শাওকানী ১৭৯৫সাল থেকে ১৮৩৪ সাল পয়ন্ত প্রধান বিচারপতির আসনে সমাসীন ছিলেন। (Bernard Haykel, Revival and Reform in Islam : The Legacy of Muhammad Al Shawkani, Cambridge Univwrsity press 2003, pp xv + 265.) একান থেকে বুঝা যায় যে, আশ্ শাওকানী ৩৫ বছর বয়সে বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বেই এ পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

১৩০. জালাল উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

মাঝেও দ্বীনের দা'ওয়াত সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর দা'ওয়াতের অন্যতম মাধ্যম ছিল লিখনী । কিন্তু এর পাশাপাশি তিনি মৌখিক দা'ওয়াতের মাধ্যমেও দ্বীনের সম্প্রসারণ কাজে ব্যাপৃত ছিলেন।

তিনি জ্ঞান বিস্তারের সাথে সাথে দ্বীনী দা'ওয়াত বিস্তারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এতদ্ব্যতীত যে বিশাল সংখ্যক ছাত্র তাঁর নিকট অধ্যয়ন করতেন, তাঁদেরকে তিনি শিক্ষাদানের পাশাপাশি দা'ওয়াত সম্প্রসারণের কাজেও নিয়োজিত করেন। এ প্রসঙ্গে জালাল উদ্দীন তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভে বলেন, "তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে দীনী জ্ঞানের সম্প্রসারণ ও কুরআনের দা'ওআত প্রদানের জন্য বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করে দ্বীনের এক মহান খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।"[১৩১] এভাবে মৌখিক, লিখিত ও শিষ্যদের মাধ্যমে দ্বীন ও কুরআনের দা'ওআত সম্প্রসারণের যে পদক্ষেপ তিনি নিয়েছিলেন তা নিঃসন্দেহে অনুকরণীয়।

'আল্লামা আশ্ শাওকানীর কর্মজীবনের বিস্তারিত বিবরণ খুব একটা পাওয়া যায় না। উপরে যা আলোকপাত করা হলো, তা থেকে অনুমান করা যায় যে, তিনি অত্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠ ও কর্মঠ ব্যক্তি ছিলেন। আজীবন জ্ঞানের সাধক এ মহান ব্যক্তির কর্ম জীবনও জ্ঞান চর্চা কেন্দ্রিকই ছিল। সংসার ও কর্ম জীবনের শত ব্যস্ততাও তাঁকে জ্ঞানানুশীলনের কেন্দ্র বিন্দু থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি ।

মৃত্যু

দ্বীনের মহান খাদেম, জ্ঞান সাধক, কর্মবীর 'আল্লামা আশ্ শাওকানী কর্ম ব্যস্ততার মাঝে জীবন পথের শেষ প্রান্তে উপনীত হন। বিচারকের দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় তিনি জীবন সায়াহ্নে এসে পৌঁছেন। এ সময় তিনি আল্লাহর 'ইবাদাতে মশগুল থাকতেন এবং তাঁর নিকট উত্তমভাবে জীবনাবসান ও উভয় জগতের কল্যাণের জন্য বেশি বেশি প্রার্থনা করতে থাকেন। অবশেষে সান'আর বিচারক থাকা অবস্থাতেই ১২৫০ হিজরী, ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দ, জমাদিউছ ছানী মাসের ২৭ তারিখ বুধবার রাতে সান'আ শহরে মৃত্যুবরণ করেন।[১৩২]

তাঁর মৃত্যুর সংবাদে হাজার হাজার লোক সমবেত হয় এবং কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। জানাযা শেষে তাঁকে ইয়ামানের সান'আ নগরীর খুজাইমা কবরস্থানে দাফন করা হয়।[১৩৩]

---

১৩১. জালাল উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

১৩২. আশ্ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, খ. ১, পৃ . ২৩, দি এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলাম , খ. ৯, পৃ. ৩৭৪; জালাল উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ . ২৮ -২৯ । দি এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলামে তার মৃত্যু সন ১৮৩৯ খৃ. এবং জালাল উদ্দীন স্বীয় গ্রন্থে তাঁর মৃত্যুসন ১৮৩৮ খৃ. উল্লেখ করেছেন।

১৩৩. আশ্ শাওকানী , প্রাত্তক, জালাল উদ্দীন, প্রাগুক্ত

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

'আল্লামা আশ্ শাওকানীর চিন্তাধারা

ইজতিহাদের ক্ষেত্রে আশ্ শাওকানীর চিন্তাধারা

'আল্লামা আশ্ শাওকানী একজন গবেষক ও চিন্তাবিদ ছিলেন। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে চিন্তা-গবেষণা করে তিনি নিজেই কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন ছিলেন। ইজতিহাদ বা গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি খুবই পারদর্শী ছিলেন। এর মূলে ছিল তাঁর সকল বিষয়ে গভীর পান্ডিত্য এবং প্রখর চিন্তাশক্তি।

তিনি সমকালীন সকল বিষয়ের উপর পারদর্শিতার কারণে জ্ঞানের রাজ্যে নির্ভরশীল ও কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন এবং সে যুগের অনন্য, অসাধারণ ও অন্যের জন্য অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন।

এ প্রসঙ্গে 'আব্দুল হাকীম কাজী বলেন, "তিনি অত্যন্ত প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। বিভিন্ন শাস্ত্র ও বিষয়ে সমধিক অবগত ছিলেন। ইমাম মলিক, আবু হানিফা, আহমাদ ইবন হাম্বল, শাফি'ঈ, ইবন তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়্যিম প্রমুখ মুজাদ্দিদ ও সাধুসজ্জনের জ্ঞানের পূর্ণ আয়ত্বকারী ছিলেন।"[১৩৪] তাঁর মেধা, স্মরণশক্তি, বোধশক্তি, অনুধাবন শক্তি প্রভৃতি ছিল খুবই তীক্ষ্ণ। এ প্রসঙ্গে জালাল উদ্দীন স্বীয় গবেষণাপত্রে উল্লেখ করেন, "মুহাম্মাদ ইবন 'আলী আশ্ শাওকানী প্রবল মেধাশক্তি, তড়িৎ বোধশক্তি, শক্তিশালী অনুধাবন ক্ষমতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও অসাধারণ স্মরণ শক্তির অধিকারী ছিলেন।"[১৩৫]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'আল্লামা আশ্ শাওকানী শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করার পূর্বেই বিভিন্ন বিষয়ে ফাতওয়া দান ও বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দান করতেন। এ প্রসঙ্গে আল বাদরুত তালি' গ্রন্থে বলা হয়েছে। "শিক্ষকের নিকট অধ্যয়নের সময়েই তিনি সান'আবাসী ও অন্যান্য যারা তাঁর নিকট ফাতওয়ার জন্য আসত তাদেরকে ফাতওয়া দান করতেন। এমন কি তাঁর শিক্ষকগণের জীবিতাবস্থায় তিহামা অঞ্চল থেকে তাঁর নিকট ফাতওয়া চাওয়া হতো। সাধারণ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি নির্বিশেষে সকলেই তাঁর নিকট ফাতওয়া চাইতো। তিনি ২০ বছর বয়স থেকেই ফাতওয়া দান করতে থাকেন।"[১৩৬]

---

১৩৪. আশ্ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, খ. ১, পৃ. ১৩।
১৩৫. জালাল উদ্দীন, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৫।
১৩৬. আশ্ শাওকানী, আল্ বাদরুত্ তালি', খ. ২, পৃ. ২৩।

এর ফলে কুরআন সুন্নাহর আলোকে চিন্তা-গবেষণা পূর্বক বিভিন্ন বিষয়ে ফায়সালা দান ও মাসয়ালা-মাসায়িল চয়নের দক্ষতা তাঁর মধ্যে সৃষ্টি হয়। এ পর্যায়ে তিনি "'ইলমে ইজতিহাদ" তথা গবেষণা শাস্ত্রে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন এবং পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করেন। এ ব্যাপারে 'আব্দুল হাকীম কাজী বলেন, "বিশ বছর বয়স হতেই তাঁর নিকট ফাতওয়া চাওয়া হতো এবং তিনি চিন্তা-গবেষণা করে ফাতওয়া দান করতেন।... তিনি তাকলীদ (অন্ধ অনুকরণ) বর্জন করে 'ইলমে ইজতিহাদে (গবেষণা শাস্ত্রে) মনোনিবেশ করেন এবং তা পূর্ণভাবে আয়ত্ব করেন। অত:পর তিনি ত্রিশ বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পূর্বেই ইজতিহাদ শুরু করেন।"[১৩৭]

তিনি এমন মুজতাহিদ (গবেষক) ছিলেন যে, এক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে টিকে থাকার মত কেউ ছিলনা।"[১৩৮]

জ্ঞান গবেষণায় ঐকান্তিকতার ফলে কালক্রমে তিনি 'মুজতাহিদে মুতলাক' বা মুক্ত চিন্তার অধিকারী পূর্ণ গবেষকে পরিণত হন।

মাযহাবের ব্যাপারে 'আল্লামা আশ্ শাওকানীর চিন্তাধারা

প্রথম দিকে তিনি যায়দিয়া[১৩৯] মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। এ মাযহাবের বিষয়ে তিনি ব্যাপক অধ্যয়ন করেন। এর আলোকে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন এবং ফাতওয়া দান করেন। এমনকি এ মাযহাবের তিনি একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। অত:পর তিনি হাদীছ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং এ বিষয়ে সে যুগের অনন্য পন্ডিতে পরিণত হন। ফলে তিনি ফিকহ্ ভিত্তিক মাযহাবের অন্ধ অনুকরণ (তাকলীদ) বর্জন করে ইজতিহাদ বা গবেষণাকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। ইজতিহাদের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের পর তিনি এ বিষয়ে তথ্য বহুল গ্রন্থ রচনা করেন। এ ব্যাপারে তাঁর লেখা দুটি বই খুবই উল্লেখযোগ্য। একটি হলো "আল কাওলুল মুফীদ ফি আদিল্লাতিল ইজতিহাদ ওয়াত তাকলীদ" এবং অন্যটি হলো "আস্ সায়লুল জারার আল মুদাফফিক আলা হাদায়িকিল আযহার"। এ গ্রন্থদ্বয়ে তিনি ইজতিহাদের যৌক্তিকতা ও তাকলীদের অসারতা বিশ্লেষণ করেন। বিশেষ করে শেষোক্ত গ্রন্থে তিনি মাসয়ালা সমূহের প্রকৃত রূপ তুলে ধরেন এবং যা দলীল দ্বারা প্রমাণিত তার শুদ্ধতা এবং যার পক্ষে কোন দলীল নেই তার অসারতার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেন।[১৪০]

---

১৩৭. আশ্ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, খ. ১, পৃ. ২৩।
১৩৮. আয্ যাহাবী, আত্ তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন, খ. ২, পৃ. ২৪৯।
১৩৯. যায়দিয়া মাযহাবের পরিচিতির জন্য পৃ. ৫, টীকা নং ৩০ দ্র.।

১৪০. আয্ যাহাবী, আত্ তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন, খ. ২, পৃ. ২৪৯; শাওকানী, নাইলুল আওতার, খ. ১, ভূমিকা, পৃ. ف।

আল্লামা আশ্ শাওকানী তাকলীদকে বর্জন করেই ক্ষান্ত হননি। বরং তিনি তাকলীদকে হারাম মনে করতেন এবং তাকলীদ বর্জন করে দলীল প্রমাণের দিকে দৃষ্টি দানের জন্য আহলে রায় ও অন্যান্যদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করেন।

তাকলীদ বর্জন, তাকে হারাম ঘোষণা এবং এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনার ফলে তদানিন্তন 'আলিম সমাজের একটি দল তাঁর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেন এবং তাঁর প্রতি নিন্দা ও বিদ্বেষের তীর নিক্ষেপ করতে থাকেন। এর ফলে সান'আ শহরে মুকাল্লিদ ও মুজতাহিদ সমর্থক দু'দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত মাথা চাড়া দিয়ে উঠে।"[১৪১]

এ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 'আল্লামা আশ্ শাওকানী নির্দিষ্ট কোন মাযহাব বা ইমামের তাকলীদে (অন্ধ অনুকরণ) বিশ্বাসী ছিলেন না । বরং তিনি ছিলেন মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তার অধিকারী একজন সুদক্ষ মুজতাহিদ। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে যেটিকে সঠিক মনে করতেন, সেটিরই তিনি অনুসরণ করতেন। সেটা কোন মাযহাব বা ইমামের পক্ষে না বিপক্ষে তার কোন তোয়াক্কা করতেন না।

তাকলীদের ব্যাপারে 'আল্লামা আশ্ শাওকানীর চিন্তাধারা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'আল্লামা আশ শাওকানী তাকলীদের (অন্ধ অনুকরণের) ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা ইমামের তাকলীদকে হারাম মনে করতেন। তিনি ফিক্হ ভিত্তিক মাযহাবের ইমামগণের তাকলীদকে আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব পরিত্যাগ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহকে উপেক্ষার শামিল বলে মনে করতেন। তাকলীদকে কেন্দ্র করেই যেহেতু তাঁর এবং সে সময়ের অন্যান্যদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সূচনা হয়েছিল এ কারণে তাকলীদ এবং এ ব্যাপারে 'আল্লামা আশ্ শাওকানীর অবস্থান কী ছিল তা আলোচনা করা প্রয়োজন।

'আল্লামা আশ্ শাওকানীর সময়ে তাকলীদ বা অন্ধ অনুকরণ মারাত্মক রূপ ধারণ করেছিল। লোকেরা নির্দিষ্ট ইমাম ও মাযহাবের অনুসরণে অন্ধ হয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে সে সময়ে যায়দিয়া সম্প্রদায় তাদের ইমামের তাকলীদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত ছিল। তারা ইজতিহাদকে অপ্রয়োজনীয় গণ্য করে এর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। 'আল্লামা আশ্ শাওকানীও প্রথম দিকে যায়দিয়া মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তিতে তিনি মাযহাবের তাকলীদ পরিত্যাগ করে ইজতিহাদে মননিবেশ করেন। তাকলীদ এর ব্যাপারে 'আল্লামা আশ্ শাওকানীর চিন্তাধারা কী ছিল তা আলোচনার পূর্বে তাকলীদ প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

---

১৪১. আয্ যাহাবী, প্রাগুক্ত; শাওকানী প্রাগুক্ত, পৃ. ص-ف।

তাকলীদের অর্থ

তাকলীদ বা অন্ধ অনুকরণ ইজতিহাদ বা মুক্ত চিন্তাধারার বিপরীত। কোন বিষয়ে সত্যে উপনীত হওয়ার জন্য নিজস্ব চিন্তার মাধ্যমে অনুসন্ধান ব্যতীত শুধুমাত্র অন্যের অনুকরণের নাম তাকলীদ। তাকলীদের অর্থ করতে গিয়ে প্রসিদ্ধ 'আরবী অভিধান আল্ মুনজিদ এ বলা হয়েছে, قلده فى كذا- اى تبعه من غير تأمل و لا نظر

"এ বিষয়ে তার তাকলীদ করল এর অর্থ কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা না করেই তার অনুসরণ করল।"

এ অভিধানে تقليد (তাকলীদ) এর অর্থে আরো বলা হয়েছে,

هو ما انتقل الى الانسان من ابائه و معلميه و مجتمعه من العقائد و العادات و العلوم و الاعمال। "পূর্বপুরুষ, শিক্ষকমন্ডলী ও সামাজিক প্রচলন প্রভৃতি হতে 'আকীদা-বিশ্বাস, অভ্যাস, জ্ঞান ও 'আমল অন্য কোন মানুষের দিকে স্থানান্তরিত হওয়াকে তাকলীদ বলে।"[১৪২]

তাকলীদের সংজ্ঞায় সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ এ বলা হয়েছে, "তাকলীদের তৃতীয় অর্থ ধর্মীয় ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মতামতের অনুসরণ; অন্যের কথা ও কাজের নির্ভুল হওয়া সম্পর্কে কোন যুক্তি-প্রমাণের সন্ধান না করিয়াই ঐগুলিকে নির্ভুল বিশ্বাস করত: প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করা।"[১৪৩]

আবু 'আব্দুল্লাহ ইবন খাওয়ায আল্ বাসরী এর সংজ্ঞায় বলেন,

التقليد معناه فى الشرع الرجوع الى قول لاحجة لقائله عليه، و ذالك ممنوع منه فى الشريعة

"শারী'আতের পরিভাষায় তাকলীদের অর্থ হলো এমন কথার দিকে প্রত্যাবর্তন করা, যে কথার অনুকূলে বক্তার কোন দলীল নেই। এটা শারী'আতে নিষিদ্ধ।"[১৪৪]

তাকলীদের প্রাদুর্ভাব

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ব্যক্তি বিশেষের তাকলীদ এবং তার ভিত্তিতে বিশেষ কোন মাযহাব সৃষ্টি হয়নি। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) দ্বীনের জ্ঞান ও আহকাম সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট থেকে প্রাপ্ত হতেন। এ সৌভাগ্য শুধু সাহাবায়ে কিরামেরই ছিল। তাবি'ঈগণ সাহাবীগণের মাধ্যমে হুবহু সে জ্ঞান ও

---

১৪২. লুইস মা'লুফ, আল্ মুনজিদ, (বৈরুত : দারুল মাশরিক,, ১৭শ সংস্করণ, ১৯৬০ খৃ.) পৃ. ৬৫৯।

১৪৩. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৬ ইং,) খ. ১, পৃ. ৪২০।

১৪৪. ইবনুল কাইয়্যিম, ই'লামুল মুয়াক্কি'ঈন, খ. ২, পৃ. ১৭৯।

আহকাম লাভ করেন, যা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট হতে সাহাবীগণ লাভ করেছিলেন। তাবি' তাবি'ঈগণও তাবি'ঈগণের মাধ্যমে সে নির্ভেজাল জ্ঞান লাভে ধন্য হয়েছিলেন।[১৪৫]

এরপর চতুর্থ যুগের লোকেরাও তাদের পদাংক অনুসরণ করেন এবং দ্বীনের বিষয়কে তাদের আলোকবর্তিকা থেকেই গ্রহণ করেন। তাঁরা দ্বীনকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেন এবং কখনই রায়, বুদ্ধিবৃত্তি, তাকলীদ বা কিয়াসকে দ্বীনের উপর অগ্রাধিকার দিতেন না। তাঁরা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির অন্ধ অনুকরণ করতেন না। বরং সত্য-সঠিক বিষয় যেখানে পেতেন সেখান থেকেই গ্রহণ করতেন।[১৪৬]

কিন্তু চতুর্থ শতাব্দীর পর থেকেই লোকেরা তাকলীদের উপর জেঁকে বসে ও নির্দিষ্ট ইমামের তাকলীদ করতে শুরু করে এবং এর ফলেই বিভিন্ন মাযহাবের সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী বলেন,

ان الناس كانوا قبل المائة الرابعة غير مجتمعين على التقليد الخالص لمذهب واحد بعينه

"হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে লোকেরা কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুকূলে নিরংকুশ তাকলীদের উপর ঐক্যবদ্ধ ছিলনা।"[১৪৭] এ ব্যাপারে ইবনুল কাইয়্যিম-এর বক্তব্য হলো,

انما حدثت هذه البدعة فى القرن الرابع المذموم على لسان رسول الله صلى الله عليه و سلم "এ বিদ'আত (তাকলীদ) সূচিত হয় (হিজরী) চতুর্থ শতাব্দীতে, যে যুগ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ভাষায় নিন্দিত।"[১৪৮]

এ ধরনের তাকলীদ এবং মাযহাবের অন্ধ অনুসরণ চিন্তার রাজ্যে স্থবিরতার সৃষ্টি করে। ইজতিহাদ বা জ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে এ স্থবিরতা সৃজনশীল জ্ঞান সাধনার পথকেও অনেকটাই রুদ্ধ করে দেয়। এতে অনুসন্ধানী চিন্তাশক্তি জ্ঞানের নতুন নতুন ক্ষেত্র আবিষ্কারের পরিবর্তে অনুকরণের ঘূর্ণাবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকে। কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতির আলোকে যে ইজতিহাদ যুগ জিজ্ঞাসার জবাব দান ও যুগোপযোগী সমাধান পেশ করে ইসলামকে গতিশীল এক কালজয়ী আদর্শে পরিণত করেছে, 'ইজতিহাদের দরজা বন্ধ' এবং 'নির্বিচার তাকলীদ' এর চলৎশক্তিকে অনেকটা শ্লথ করে দেয়।

অবশ্য এ অবস্থার মাঝেও একদল বিশেষজ্ঞের পক্ষ হতে দাবী করা হয় যে, তারা যেন দলীল প্রমাণযোগে নিজ নিজ মুজতাহিদের 'ইজতিহাদ' নির্ভুল হওয়া সম্পর্কে অবহিত

---

১৪৫. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬।
১৪৬. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬-৭।
১৪৭. শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলবী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, (দিল্লী : মাকতাবায়ে থানুবী, ১৯৮৬ খৃ.) খ. ১, পৃ. ৩৬৮।
১৪৮. ইবনুল কায়্যিম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৯১।

থাকেন। পরবর্তীকালে আল্ জুয়াইনী ও 'আল্লামা সুয়ূতী অবাধ ইজতিহাদ করার অধিকার দাবী করেন। ইমাম আল গাযালী (রহ.) শিয়া সম্প্রদায়ের ইমামদের তাকলীদের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন।

দাউদ ইবন 'আলী, ইবন হাযম ও অন্যান্য জাহিরী বিশেষজ্ঞগণ তাকলীদের নিন্দা করেন এবং পরবর্তী বিজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্য ইজতিহাদকে অবশ্য কর্তব্য বলে নির্দেশ দেন।

হিজরী ৮ম শতাব্দীতে ইবন তাইমিয়া এবং তদীয় ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম প্রচলিত গতানুগতিক তাকলীদের নিন্দা করেন। তাঁরা তাকলীদ বা গতানুগতিক অন্ধ অনুকরণের বিরোধিতা করেন এবং ইজতিহাদের প্রয়োগ আরম্ভ করেন।[১৪৯]

তাকলীদ বর্জন করে ইজতিহাদের প্রয়োগ আরম্ভকারীদের ধারাবাহিকতায় 'আল্লামা আশ্ শাওকানী ছিলেন অন্যতম। তিনি তাকলীদের অসারতা প্রমাণে কলমও ধরেন শক্ত হাতে। তাঁর বিভিন্ন লেখায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্নে তাকলীদের ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাধারার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো :

'আল্লামা আশ্ শাওকানী তাকলীদের হুকুমের ব্যাপারে 'ইরশাদুল ফুহুল ইলা তাহকীকিল হাক্কি মিন 'ইলমিল উসূল' নামক গ্রন্থে বলেন, "শারী'আতের শাখা-প্রশাখার মাসয়ালার ক্ষেত্রে তাকলীদ বৈধ কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। একদল বিশেষজ্ঞের মতে সাধারণভাবে তা জায়িয নয়। কারাফী (রহ.) বলেন, ইমাম মালিক এবং জমহুর 'উলামার মতে ইজতিহাদ আবশ্যক এবং তাকলীদ বাতিল। ইবন হাযম তাকলীদ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ইজমা' রয়েছে বলে দাবী করেছেন। তিনি মালিক (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি মানুষ, আমার ভুল শুদ্ধ উভয়ই হতে পারে। সুতরাং আমার অভিমতের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ করে দেখ। কিতাব ও সুন্নাহর অনুকূল হলে গ্রহণ কর, অন্যথায় বর্জন কর। ইবন হাযম বলেন, ইমাম মালিকের মত শাফি'ঈ, আহমাদ এবং আবু হানিফাও তাকলীদকে নিষিদ্ধ করেছেন। মাযানী শাফি'ঈ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সর্বদাই নিজের এবং অন্যের তাকলীদ করতে নিষেধ করতেন। জামহুর এর মতে তাকলীদ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ইজমা' সংঘটিত না হলেও তা নিষিদ্ধ হওয়া জোরদার হয় ঐ বর্ণনার দ্বারা, যেখানে মৃত ব্যক্তির তাকলীদ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ইজমা' হয়েছে বলে বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে মুজতাহিদ যদি কোন বিষয়ে কোন দলীলের সন্ধান না পান, তাহলে সে ক্ষেত্রে স্বীয় রায় বা চিন্তা প্রসূত অভিমতের আলোকে 'আমল করা তাঁর জন্য বৈধ। কিন্তু অন্যের জন্য সে মতানুযায়ী 'আমল করা বৈধ নয় এ ব্যাপারে

---

১৪৯. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ১, পৃ. ৪২০-৪২১।

ইজমা' রয়েছে। বর্ণিত এ দু'টি ইজমা'র দ্বারাই তাকলীদ একেবারেই নিষিদ্ধ হওয়া প্রমাণিত হয়।

তৃতীয় একটি মত হলো, সাধারণ লোকের জন্য তাকলীদ আবশ্যক, কিন্তু মুজতাহিদদের জন্য নিষিদ্ধ। চার ইমামের অনুসারীদের অনেকেই এ মতের প্রবক্তা। কিন্তু এ কথা সুবিদিত যে, মতভেদের ক্ষেত্রে শুধু মুজতাহিদের কথা গ্রহণযোগ্য। অনুসারীরা যেহেতু মুকাল্লিদ, সেহেতু মতভেদের ক্ষেত্রে তাদের কথা গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষত: যখন চার ইমাম তাঁদের এবং অন্যদের তাকলীদ করতে তাঁদেরকে নিষেধ করেছেন। আশ্চর্য ও আফসোসের বিষয় হলো তারা তাদের এ সকল ইমামের কথাকে শুধু মুজতাহিদদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, মুকাল্লিদদের জন্য নয়, বলে অর্থ নিয়েছে।

এর চেয়েও আশ্চর্যের বিষয় হলো, পরবর্তিতে যারা উসূলে ফিক্‌হের গ্রন্থ রচনা করেছেন, তারা এ কথাকে অধিকাংশের কথা বলে চালিয়ে দিয়ে তাকলীদকে অস্বীকার না করার ইজমা' হিসেবে তাদের পক্ষে দলীল নির্ধারণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে যদি তারা উত্তম যুগ, অত:পর তৎপরবর্তী যুগ এবং তারপর তৎপরবর্তী যুগ বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে তাদের এ দাবী বাতিল। কারণ, এ সকল যুগে কোন তাকলীদের অস্তিত্ব ছিলনা, তাকলীদ কী তা তারা জানতেন না এবং তাকলীদের কথা শুনেনওনি। বরং তারা শুধু কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে 'আলিম ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করতেন এবং তিনি কুরআন-সুন্নাহর দলীল যা জানতেন তার আলোকে ফাত্ওয়া দিতেন। এটা কোন তাকলীদ ছিলনা, বরং এটা ছিল কোন বিষয়ে আল্লাহর হুকুম কী এবং শারী'আতের দলীল কী তা জানতে চাওয়া। কারণ তাকলীদ হলো রিওয়ায়াতের ভিত্তিতে 'আমল না করে কোন ব্যক্তির রায় বা ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে 'আমল করার নাম ।

فاسألوا اهل الذكر 'তোমরা জ্ঞানবান ব্যক্তিদের নিকট জিজ্ঞেস কর' এ আয়াত দ্বারা তাকলীদ বৈধ হওয়ার পক্ষে যে দলীল দেয়া হয়, তা সঠিক নয়। কারণ এখানে জিজ্ঞেস করা বলতে বুঝানো হয়েছে কোন বিষয়ে আল্লাহর হুকুম কী সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করাকে। অধিকন্তু এ আয়াতটি 'আম (সাধারণ) নয়, যেমন তারা মনে করে। বরং এটি নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। আর তা হলো নবীগণ যে পুরুষ লোকই হন, সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা। আয়াতের পূর্বাপর লক্ষ্য করলে সেটিই প্রতীয়মান হয়। যেখানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

و ما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

"তোমার পূর্বে আমি পুরুষ ব্যতীত অন্য কাউকে প্রেরণ করিনি যার নিকট আমি ওহী পাঠিয়েছি। যদি তোমাদের জানা না থাকে তাহলে জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে জিজ্ঞেস কর।"

পক্ষান্তরে এর দ্বারা যদি চার ইমামের ইজমা'র কথা বুঝানো হয়, তাহলে এটি জানা কথা

যে, তাঁরা তাকলীদ নিষেধের কথা বলেছেন এবং তাঁদের যুগে কেউ এটা (তাকলীদ নিষেধ হওয়াকে) অস্বীকার করত না। আর যদি তাঁদের পরে ইজমা' হয়েছে বলে বুঝানো হয়, তাহলে এ কথা সুস্পষ্ট যে, তখন থেকে আজ পর্যন্ত তাকলীদের অস্বীকারকারী বিদ্যমান রয়েছে। অপর পক্ষে যদি ইজমা'র দ্বারা চার ইমামের মুকাল্লিদদের ইজমা' বুঝানো হয়, তাহলে এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন ব্যাপারে মুকাল্লিদদের কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

মোট কথা যারা তাকলীদকে বৈধ মনে করে, তারা এর পক্ষে সঙ্গত কোন দলীল উপস্থাপন করতে কখনই সক্ষম হয়নি, যা যুক্তির ধোপে টিকে। আর আমাদেরকে আল্লাহর শারী'আতকে কোন ব্যক্তির বা ব্যক্তিবর্গের রায়ের দিকে প্রত্যর্পণ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি, বরং আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আল্লাহর বাণী অনুযায়ী,

فان تنازعتم في شئ فردوه الي الله والرسول "যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতভেদে লিপ্ত হও, তাহলে তা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যর্পণ কর।"

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবীগণকে কোথাও প্রেরণ করলে নির্দেশ দিতেন আল্লাহর কিতাবের দ্বারা ফায়সালা করতে। সেখানে না পাওয়া গেলে আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহর দ্বারা, সেখানেও না পাওয়া গেলে তার চিন্তা ও অভিমত অনুযায়ী যেটি তার নিকট সঠিক বলে সুস্পষ্ট হবে সে অনুযায়ী। যেমন মু'আয (রা.) এর হাদীছে রয়েছে।[১৫০] তাকলীদের অনুসারীরা আরো একটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন,

তাহলো যারা শারী'আতের দলীল বুঝতে অপারগ তাদের তো তাকলীদ ছাড়া উপায় নেই। এটিকে তারা তাকলীদের দলীল হিসেবে পেশ করেন। কিন্তু বিষয়টি সঠিক নয়। কারণ ইজতিহাদ ও তাকলীদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী একটি বিষয় রয়েছে। তাহলো, অজ্ঞ লোকদের সামনে কোন বিষয় আসলে শারী'আতের হুকুম জানার জন্য তারা 'আলিমকে জিজ্ঞেস করবে, সে ব্যক্তির অবৈধ রায় বা শুধুমাত্র ইজতিহাদকে জানার জন্য নয়। সাহাবী এবং তাবি'ঈদের মধ্যে যারা শারী'আতের দলীল জানতে অপারগ ছিলেন, তাঁদের 'আমল এমনটিই ছিল। অধিকন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কিতাবে অনেক আয়াতে

---

১৫০. এখানে সে হাদীছের কথা বলা হয়েছে যে, যখন মু'আয (রা.) কে ইয়ামানে পাঠালেন, তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বললেন,সেখানে গিয়ে তুমি কিসের দ্বারা ফায়সালা করবে? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাবের দ্বারা। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সেখানে যদি না পাও? তিনি বললেন, তাহলে সুন্নাহর দ্বারা, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবার বললেন, সেখানেও যদি না পাও? তিনি বললেন, তাহলে তখন আমি আমার চিন্তার দ্বারা ইজতিহাদ করব। একথা শুনে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অত্যন্ত খুশী হয়ে বলেছিলেন, শুকরিয়া সেই আল্লাহর যিনি তাঁর রাসূলের দূতকে এমন সামর্থ দিয়েছেন, যার কারণে তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট।

মুকাল্লিদদের নিন্দা করেছেন। যেমন انا وجدنا اباءنا علي امة "আমরা আমাদের পূর্বপুরুষকে একটি নীতির উপর পেয়েছি।"

اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله "তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পণ্ডিত-পুরোহিতদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।"

انا اطعنا سادتنا و كبراءنا فاضلونا السبيلا "আমরা তো আনুগত্য করেছি আমাদের নেতা ও বড়দের, তারাই তো আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে।"

এখানে 'আল্লামা যারাকশী মুযানী থেকে যে চমৎকার বক্তব্য বিবৃত করেছেন, তা উল্লেখ করা হলোঃ

"যে ব্যক্তি তাকলীদের হুকুম দেয়, তাকে বলা হবে, এ ব্যাপারে কি তোমার নিকট কোন দলীল আছে? যদি সে বলে, হ্যাঁ, তাহলে তো তাকলীদ বাতিল হয়ে গেল। কারণ দলীল দ্বারাই বিষয়টি আবশ্যক করা হয়েছে, তাকলীদ দ্বারা নয়। যদি সে বলে, কোন জ্ঞান ছাড়াই এ হুকুম দিয়েছি, তাহলে তাকে বলা হবে, কোন দলীল ছাড়াই কেন রক্তপাত করছো, স্ত্রী অঙ্গকে হালাল করছ এবং সম্পদকে বৈধ করছ, যা আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন? যদি সে বলে যে, আমি জানি যে আমি ঠিক কাজই করছি, যদিও আমি তার দলীল অবগত নই। কারণ আমার শিক্ষক একজন বড় পণ্ডিত ব্যক্তি। তাহলে তাকে বলা হবে, তোমার শিক্ষকের শিক্ষকের তাকলীদ করা তো অধিকতর উত্তম। কারণ, তিনিও হয়তো কোন দলীল দ্বারাই কথা বলেছেন, যা তোমার শিক্ষকের নিকট গোপন ছিল। সে যদি বলে হ্যাঁ, ঠিকই, তাহলে সে তার শিক্ষকের তাকলীদ বর্জন করে শিক্ষকের শিক্ষকের তাকলীদ করবে এবং এভাবে চলতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত তা সাহাবীগণের 'আলিমের নিকট পর্যন্ত পৌঁছবে। তিনি যদি এটি করতে অস্বীকৃত হন, তাহলে তার কথা পন্ড হয়ে যাবে। এবং তাকে বলা হবে, কিভাবে অপেক্ষাকৃত ছোট ও কম জ্ঞানের অধিকারীর তাকলীদ জায়িয হবে অথচ তার অপেক্ষা বড় ও বেশি জ্ঞানীর তাকলীদ অবৈধ হবে? এভাবে সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছার পর তাকে বলা হবে, এ হলেন সেই সাহাবী, যিনি তাঁর জ্ঞান গ্রহণ করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর বান্দাদের প্রতি প্রেরিত রাসূল থেকে, যিনি কথা ও কাজে ছিলেন নির্ভুল ও নিষ্পাপ। সুতরাং তাঁর তাকলীদ করা সাহাবীর তাকলীদ করার চেয়ে উত্তম।"[১৫১]

'আল্লামা আশ্ শাওকানী স্বীয় তাফসীর ফাতহুল কাদীরে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতকে তাকলীদ হারাম হওয়ার দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলোঃ

---

১৫১. শায়খ মুহাম্মাদ 'আব্দুহু, তাফসীরুল কুরআনিল হাকীম (আল মানার), (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ্, তা.বি) খ. ৭, পৃ. ২০৬-২০৯।

(ক) এ ক্ষেত্রে তিনি সূরা আল আরাফের ২৮ নং আয়াতের উল্লেখ করেন, যেখানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا و الله امرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون علي الله ما لا تعلمون

"যখন তারা কোন অশ্লীল কার্যে লিপ্ত হতো তখন বলতো, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এর উপর পেয়েছি এবং আল্লাহই আমাদেরকে এর নির্দেশ দিয়েছেন। আপনি বলুন, আল্লাহ কখনো কোন অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহর উপর এমন কথা আরোপ করতে চাও, যা তোমরা জান না?" এ আয়াতকে তাকলীদের বিরুদ্ধে দলীল হিসেবে পেশ করে তিনি বলেন, "যে সকল মুকাল্লিদ (অন্ধ অনুসরণকারী) সত্য বিরোধী মাযহাবের ক্ষেত্রে পূর্ব পুরুষদের অনুসরণ করে, এ আয়াতে তাদের জন্য বড় ধরনের ধমক ও কঠোর উপদেশ রয়েছে। কেননা এটা মূলত কুফরের অনুসারীদের অনুসরণ, সত্যের অনুসারীদের নয়। কারণ তারা বলে, انا وجدنا اباءنا علي امة و انا علي اثارهم مقتدون "আমরা তো আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে একটি নীতির উপর পেয়েছি আর আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করছি।" (আয্ যুখরুফ : ২৩) তারা আরো বলে, "আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এর উপর পেয়েছি এবং আল্লাহ আমাদেরকে এর নির্দেশ দিয়েছেন।" (আল আ'রাফ :২৮) যদি মুকাল্লিদ ব্যক্তি এ প্রতারণার শিকার না হতো যে, সে পূর্বপুরুষকে যে মাযহাবের উপর পেয়েছে, তার বিশ্বাস মতে সেটি আল্লাহর নির্দেশ এবং সত্য সঠিক তাহলে সে এর উপর স্থায়ী থাকতো না। আর এটাই সে স্বভাব যার কারণে ইহুদীরা ইহুদীবাদে ও খৃস্টানরা খৃস্টবাদের উপর এবং বিদ'আত পন্থীগণ বিদ'আতের উপর টিকে থাকে। এ বিভ্রান্তির উপর তাদের টিকে থাকার কারণ তাদের পূর্বপুরুষকে ইহুদীবাদ, খৃস্টবাদ ও বিদ'আতের উপর পাওয়া এবং তাদের ব্যাপারে ভাল ধারণা পোষণ ও তা আল্লাহ নির্দেশিত সঠিক পথ বলে ধারণা ব্যতীত আর কিছুই নয়। তারা মূলত নিজের ব্যাপারে কোন চিন্তা করে না। সত্যকে সঠিকভাবে অনুসন্ধান করে না এবং আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আলোচনা-পর্যালোচনা করে না । বস্তুত: এটাই হলো অবৈধ তাকলীদ এবং নির্ভেজাল ত্রুটি। ... তারা ভালর সঙ্গে মন্দকে, শুদ্ধর সঙ্গে অশুদ্ধকে এবং ভ্রান্ত রায়ের (অভিমত) সঙ্গে বিশুদ্ধ বর্ণনাকে মিশ্রিত করে ফেলেছে । অথচ আল্লাহ এ উম্মাতের জন্য একজন মাত্র রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁরই অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁর বিরোধিতা নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, و ما اتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا "রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে, তা থেকে বিরত থাক।" (আল হাশর : ৮) যদি মাযহাবের ইমামগণের অভিমত ও তাঁদের অনুসরণ করা বান্দার জন্য দলীল বলে গণ্য হতো, তাহলে এ উম্মাতের জন্য যত

অভিমতের অধিকারী রয়েছে, তত সংখ্যক রাসূলের আবশ্যক হতো। আল্লাহর বিতাব, রাসূলের সুন্নাহ, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে এতদোভয়ের গ্রহণকারী বিদ্যমান থাকতে এবং তাদের বোধশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মুকাল্লিদগণের বিভিন্ন ব্যক্তির রায় বা অভিমত গ্রহণ করা সবচেয়ে আশ্চর্যজনক গাফলতি ও সত্য হতে বড় ধরনের বিচ্যুতি।"[১৫২]

(খ) সূরা আততাওবার ৩১ নং সায়াত

اتخذوا احبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله و المسيح ابن مريم و ما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا اله إلا هو سبحانه عما يشركون

"তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পন্ডিত ও পুরোহিতদেরকে এবং মারইয়াম তনয় 'ঈসাকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে। অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে শুধু এক ইলাহর 'ইবাদাত করার জন্য। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তারা যা কিছু শরীক করে তা থেকে তিনি পবিত্র।" এ আয়াত থেকে দলীল গ্রহণ করে 'আল্লামা আশ্ শাওকানী বলেন, "এ আয়াতে বিবেকবান লোকদেরকে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাকলীদ ও কুরআন-সুন্নাহর উপর পূর্ববর্তীদের কথাকে অগ্রাধিকার দেওয়াকে কঠোরভাবে ধমকানো হয়েছে। কেননা নস তথা কুরআন-সুন্নাহয় যা এসেছে এবং আল্লাহ প্রদত্ত দলীল-প্রমাণাদির দ্বারা যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার বিপরীতে মাযহাবের কারো কথার বা এ উম্মাতের কোন 'আলিমের তরীকাকে অনুসরণ করা ইহুদী ও নাসারাদের আল্লাহকে বাদ দিয়ে পন্ডিত-পুরোহিতদেরকে রব হিসেবে গ্রহণের শামিল। কারণ এটা প্রমাণিত যে, ইহুদী-নাসারা তাদের পন্ডিত-পুরোহিতদের 'ইবাদাত করতো না বরং তাদের আনুগত্য করতো এবং তাদের হালাল করা বস্তুকে হালাল ও হারাম করা বস্তুকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করতো। আর এ উম্মাতের মুকাল্লিদরাও এ কাজই করে থাকে। এ কাজ মূলত: ইহুদী-নাসারাদের কাজের পরিপূর্ণ সাদৃশ্যের নামান্তর।"[১৫৩]

(গ) সূরা আল আম্বিয়ার ৫২, ৫৩ ও ৫৪ নং আয়াত

اذ قال لابيه و قومه ما هذه التماثل التي انتم لها عاكفون- قالوا وجدنا أباءنا لها عابدون- قال لقد كنتم انتم و أباءكم في ضلال مبين

"যখন ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) তাঁর পিতা ও স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন, এ মূর্তিগুলো কী যাদের তোমরা পূজারী হয়ে বসে আছ? তারা বলল, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এ গুলোর পূজা করতে দেখেছি। তিনি বললেন, তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা প্রকাশ্য গোমরাহীতে লিপ্ত।"

---

১৫২. আশ্ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, খ. ২, পৃ. ১৮৯।
১৫৩. আশ্ শাওকানী, প্রগুক্ত, পৃ. ১৮৭; যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪।

এ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় 'আল্লামা আশ্ শাওকানী বলেন,. "এখানে আমরা মুকাল্লিদদের নিন্দাবাদ লক্ষ্য করি। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) মূর্তিপূজার কারণ জিজ্ঞেস করায় মুশরিকরা যেমন উত্তর দিয়েছিল যে, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এ গুলোর ইবাদাত করতে দেখেছি, অনুরূপভাবে ইসলামী মিল্লাতের মধ্য হতে যারা মুকাল্লিদ, তারাও এ ধরনের উত্তরই দিয়ে থাকে। কেননা কুরআন-সুন্নাহয় বিজ্ঞ ব্যক্তি যখন দলীল বিরোধী কোনো রায় (অভিমত) এর দ্বারা 'আমলকে অস্বীকার করে, তখন তারা বলে, 'এটা তো আমাদের ইমাম বলেছেন, যার অনুকরণ করতে ও যার রায় গ্রহণ করতে আমরা আমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেখে আসছি'। তাদের এ ধরনের উক্তির জবাব, যা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এখানে দিয়েছেন, 'নি:সন্দেহে তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষগণ সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত।' অর্থাৎ এমন প্রকাশ্য ক্ষতিতে লিপ্ত, যা কারো নিকট অস্পষ্ট নয় এবং কোন বিবেকবান ব্যক্তির নিকট তা সংশয়যুক্ত নয়। কারণ ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর সম্প্রদায় এমন মূর্তির পূজা করত, যা কারো কোন ক্ষতি বা উপকার করতে এবং শ্রবণ বা দর্শন করতে সক্ষম ছিলনা। এর চেয়ে বড় ভ্রান্তি ও ক্ষতি আর কিছুই হতে পারে না। আর মুসলিমদের মধ্যে যারা মুকাল্লিদ, তারা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহর পরিবর্তে এমন কোন গ্রন্থকে গ্রহণ করে, যেখানে কোন 'আলিমের ইজতিহাদ সংকলন করা হয়।"[১৫৪]

তাকলীদের ব্যাপারে 'আল্লামা আশ্ শাওকানী যে চিন্তাধারা পোষণ করতেন, তা সঠিক এবং জামহুর ইমামগণের চিন্তাধারার অনুকূল। চার ইমামসহ অন্যান্য চিন্তাবিদদের মতামতও অনুরূপ।

তাকলীদের ব্যাপারে ইমামগণের অভিমত

চার ইমামসহ অন্যান্য সকল ইমাম তাকলীদ করতে নিষেধ করেছেন। তাঁরা কুরআন-সুন্নাহর দলীলের বর্তমানে তাঁদের কথার অনুসরণ করার অনুমতি দেননি। তাকলীদের ব্যাপারে বিভিন্ন ইমামের মতামত নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :

১. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর অভিমত : তাকলীদ নয়, বরং হাদীছের উপর

'আমল করার প্রতিই তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন, اذا صح الحديث

فهو مذهبي "কোন হাদীছ সহীহ্ বলে প্রমাণিত হলে সেটিই আমার মাযহাব"[১৫৫]

روى عن ابى حنيفة انه كان يقول لا ينبغى لمن لم يعرف دليلى ان يفتى بكلامى وكان

১৫৪. আয্ যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫।

১৫৫. 'আব্দুল কারীম মিরাক ও 'আব্দুল মুহসিন 'আব্বাদ, মিন আত্ইয়াবিল মানহি ফি 'ইলমিল মুসতালিহ,, (মাদীনা : মাতাবি'উ জামি'আতিল মাদীনাতিল মুনাওয়ারা, ১৪১০ হি.) পৃ. ৭৮।

اذا افتى يقول هذا رأى النعمان بن ثابت يعنى نفسه وهواحسن ما قدرنا عليه فمن جاء باحسن منه فهو اولى بالصواب

"ইমাম আবু হানীফা (রহ.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি আমার দলীল সম্পর্কে অবহিত নয়, তার জন্য আমার কথার দ্বারা ফাত্ওয়া দেয়া উচিৎ নয়। তিনি যখন ফাত্ওয়া দিতেন, তখন বলে দিতেন, এটা নু'মান ইবন ছাবিতের (নিজেকে বুঝাতেন) অভিমত। আমাদের যে সামর্থ রয়েছে, সে অনুযায়ী এটা উত্তম। যদি কেউ এর চেয়ে উত্তম কিছু নিয়ে আসে তাহলে সঠিক হওয়ার জন্য সেটিই ভাল।"[১৫৬] তিনি আরো বলেন, "আমরা কোথা থেকে বলেছি, তা না জেনে আমাদের কথার দ্বারা কোন কিছু বলা কারো জন্য জায়িয নয়।"[১৫৭]

২. ইমাম শাফি'ঈ (রহ.)-এর অভিমত : মুযানী তাঁর মুখতাসারে বলেন,

نهى الشافعى عن تقليده و تقليد غيره

"শাফি'ঈ (রহ.) তাঁর এবং অন্য কারো তাকলীদ করতে নিষেধ করেছেন।"[১৫৮] তিনি আরো বলেন, اذا صح الحديث فهو مذهبى "হাদীছ যদি বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে সেটিই আমার মাযহাব।"

لو رأيت كلامى يخالف الحديث فاعملوا بالحديث و اضربوا بكلامى الحائط "যদি তোমরা আমার কথাকে হাদীছের বিরোধী দেখতে পাও, তাহলে হাদীছের ওপর 'আমল কর এবং আমার কথাকে দেওয়ালে ছুঁড়ে মার।" তিনি আরো বলেন, اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة من رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحل له ان يدعها لقول احد "মুসলিমগণ এ বিষয়ে একমত (اجماع) হয়েছে যে, যার নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীছ সুস্পষ্ট হয়েছে, তার জন্য অন্য কারো কথায় তা বর্জন করা জায়িয নয়।"[১৫৯]

৩. ইমাম মালিক (রহ)-এর অভিমত :

ما من احد الا و هو مأخوذ من كلامه و مردود عليه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم

"রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যতীত অন্য সকলের কথা গ্রহণযোগ্য এবং

---

১৫৬. শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, উর্দু মুতারজাম, (দেওবন্দ : মাকতাবাহ্ থানুবী, ১৯৮৬ ইং) খ. ১, পৃ. ৩৮০।
১৫৭. ইবনুল কাইয়্যিম, ই'লামুল মুয়াক্কি'ঈন, খ. ২, পৃ. ১৯৫।
১৫৮. শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, খ. ১, প. ৩৭৫।
১৫৯. উদ্ধৃতিগুলোর জন্য দ্র. 'আব্দুল কারীম মিরাক. ও 'আব্দুল মুহসিন 'আব্বাদ, মিন আত.ইয়াবিল মানহি ফি 'ইলমিল মুসতালিহ, পৃ. ৭৯; শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, খ. ১, পৃ. ৩৮০।

প্রত্যাখ্যানযোগ্য উভয়ই হতে পারে। (কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সকল কথাই গ্রহণযোগ্য।[১৬০]

৪. ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ)-এর অভিমত : لا تقلدني ولا تقلدن مالكا و لا اوزاعى و لا النخعى و لا غيرهم و خذ الاحكام من حيث اخذوا من الكتاب و السنة "তুমি আমার, মালিকের, আওযা'ঈর, নাখ'ঈ বা অন্য কারো তাকলীদ করোনা। বরং তারা যে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আহকামসমূহ গ্রহণ করেছে তুমিও সেখান থেকেই গ্রহণ কর।"[১৬১]

৫. ইমাম আবু ইউসুফ (রহ), ইমাম যুফার (রহ)-এর অভিমত,

لا يحل لاحد ان يفتى بقولنا ما لم يعلم من اين قلنا

"যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কোথা থেকে বলেছি তা না জানবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কথা দ্বারা ফাত্ওয়া দেয়া কারো জন্য বৈধ নয়।"[১৬২]

৬. ইবন হাযম (রহ)-এর অভিমত,

التقليد حرام لا يحل لاحد ان يأخذ قول احد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا برهان

"তাকলীদ সম্পূর্ণ হারাম। কারো জন্য এটা জায়িয নয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যতীত অন্য কারো কথা বিনা প্রমাণে গ্রহণ করবে।"[১৬৩]

৭. ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ)-এর অভিমত

"অন্ধ অনুসরণকারী এক অনির্ভরযোগ্য ভিত্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। আর

তাতে বিবেক-বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ অকেজো করে রাখা হয়। বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-বিবেচনা শক্তি মানুষের জন্যে আল্লাহ প্রদত্ত একটি মহৎ গুণ। তাকলীদ বা অন্ধ অনুকরণের নীতি গ্রহণ করা হলে এ মহৎ গুণের যাবতীয় কল্যাণ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা হয়। যার হাতে আলোর মশাল রয়েছে সে যদি তা নিভিয়ে অন্ধকারে পথ চলতে শুরু করে, তবে তার এ হাস্যকর আচরণ কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হতে পারে না।"[১৬৪]

---

১৬০. শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী, হু.জ্জাতুল্লাহিল বালিগা, খ. ১, প. ৩৭৯।

১৬১. ইবনুল কাইয়্যিম, ই'লামুল মুয়াক্কি'ঈন, খ. ২, পৃ. ১৮৩; 'আব্দুল কারীম মিরাক. ও 'আব্দুল মুহসিন 'আব্বাদ, প্রাগুক্ত; শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী, হু.জ্জাতুল্লাহিল বালিগা, খ. ১, পৃ. ৩৮০-৩৮১।

১৬২. শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী, প্রাগুক্ত। খ. ১, পৃ. ৩৮১।

১৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭২।

১৬৪. 'আল্লামা ইউসুফ কারযাবী, আল্ হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম, বঙ্গানুবাদ, মাও. 'আব্দুর রহীম, ইসলামে হালাল হারামের বিধান, (ঢাকা : খাইরুন প্রকাশনী, ১২ সং, ২০০৬ ইং) পৃ. ১৭।

প্রশংসনীয় তাকলীদ

সকল তাকলীদই নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ নয়। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তা প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং কোন কোন তাকলীদ প্রশংসাযোগ্য হয়ে থাকে। চিন্তা-গবেষণা ও যথাসাধ্য চেষ্টা-সাধনার পরও সংশ্লিষ্ট বিষয়টি যদি কারো নিকট অস্পষ্ট থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে আন্দাজ-অনুমান করে কোন ফায়সালা প্রদান বা 'আমল করা ঠিক নয়। এ ধরনের ক্ষেত্রে তার চেয়ে অধিকতর জ্ঞানী ব্যক্তির তাকলীদ বা অনুকরণ করাই যুক্তিযুক্ত। এ প্রসঙ্গে ইবনুল কাইয়্যিম বলেন,

وأما تقليد من بذل جهده فى اتباع ما انزل الله، وخفى عليه بعضه، فقلده فيه من هو اعلم منه، فهذا محمود غير مذموم، مأجور غير مأزور

"আল্লাহর নাযিল করা বিধানের অনুসরণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানোর পরও যদি কিছু বিষয় তার নিকট অস্পষ্ট থাকে, অত:পর সেক্ষেত্রে যদি তার অপেক্ষা অধিকতর কোন জ্ঞানী ব্যক্তির তাকলীদ করে, তাহলে এ ধরনের তাকলীদ নিন্দনীয় নয়, বরং প্রশংসনীয়, পাপের নয়, বরং পুণ্যের।"[১৬৫]

তবে এ ধরনের ক্ষেত্রে যার তাকলীদ করা হবে, সে ব্যক্তিকে অবশ্যই তার চেয়ে বিজ্ঞ হতে হবে। তার সমকক্ষ বা তার চেয়ে কম বিজ্ঞ হলে, সে ধরনের ব্যক্তির তাকলীদ করা জায়িয হবে না।[১৬৬]

আবশ্যকীয় তাকলীদ

তাকলীদ কখনো কখনো আবশ্যক হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে উবাই (রাহ.)এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, ما استبان لك فاعمل به، و ما اشتبه عليك فكله الى عالمه

"যা তোমার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যায় তার ওপর 'আমল কর, আর যা তোমার উপর সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে, সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যিনি বিজ্ঞ, তার উপর নির্ভর কর।"[১৬৭]

এ প্রসঙ্গে ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, "আমাদের রবের কিতাব, আমাদের নবীর সুন্নাহ্ ও তাঁর সাহাবীগণের উক্তির আলোকেই এটা আমাদের জন্য আবশ্যক। যেহেতু আল্লাহ সুবহানাহু প্রত্যেক বিজ্ঞ ব্যক্তির উপর অধিকতর বিজ্ঞ ব্যক্তি সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং কোনো সঠিক বিষয় যদি কারো কাছে অস্পষ্ট থাকে, আর সে যদি তা তার চেয়ে অধিক বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট সোপর্দ করে, তাহলে সে সঠিক কাজ করলো। কারণ এতে কুরআন,

---

১৬৫. ইবনুল কাইয়্যিম, ই'লামুল মুয়াক্কি'ঈন, খ. ২,পৃ. ১৬৯।
১৬৬. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮৮
১৬৭. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৪২।

সুন্নাহ্ ও সাহাবায়ে কিরামের উক্তিকে উপেক্ষা করা হয়না, উক্ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে এর মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করা হয়না, তার কথার কারণে নস'কে বর্জন করা হয়না এবং তার সকল ফাত্ওয়া গ্রহণ করা ও তিনি যার বিরোধিতা করেছেন তার সকল কিছুকে প্রত্যাখ্যান করা হয়না।"[১৬৮]

একান্ত প্রয়োজনবশত: অগত্যা তাকলীদের আশ্রয় নেয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। যেখানে কুরআন-সুন্নাহর কোন দলীল পাওয়া যায়না, সেখানে বাধ্য হয়েই অধিকতর বিজ্ঞ ব্যক্তির তাকলীদ করতে হয়। পূর্বকালের ইমামগণ খুব কম ক্ষেত্রে কখনো কখনো যে তাকলীদ করেছেন, তা কেবলমাত্র এ ধরনের ক্ষেত্রেই করেছেন।

চরম সংকটকালে অগত্যা মৃত জন্তুর গোশ্ত খাওয়া যেমন বৈধ, তেমনি একান্ত প্রয়োজনের সময় তাকলীদ ব্যতীত গত্যন্তর না থাকলে সেক্ষেত্রেও তাকলীদ করা বৈধ। যে ক্ষেত্রে এমন জরুরী প্রয়োজন নেই সে ক্ষেত্রে তাকলীদ বৈধ নয়। এ প্রসঙ্গে ইবনুল কায়্যিম বলেন, "তাকলীদ একান্ত প্রয়োজনবশত:ই কেবল বৈধ হয়। যে ব্যক্তি কুরআন, সুন্নাহ্, সাহাবীগণের উক্তি এবং দলীল-প্রমাণাদির দ্বারা সত্য উদঘাটনের সামর্থ থাকা সত্ত্বেও সেগুলোকে বাদ দিয়ে তাকলীদের দিকে ধাবিত হয়, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে জবেহ্কৃত পবিত্র গোশ্তের সামর্থ থাকা সত্ত্বেও মৃত জন্তুর গোশ্ত ভক্ষণের দিকে ধাবিত হয়। কেননা মূলনীতি হলো এই
যে, একান্ত জরুরত ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় কারো কথা বিনা দলীল-প্রমাণে গ্রহণ করা যাবে না।"[১৬৯]

আশ্ শাওকানীর মতে সকল প্রকার তাকলীদ-ই অবৈধ

'আল্লামা আশ্ শাওকানী সকল প্রকার তাকলীদকেই অবৈধ গণ্য করতেন। তিনি সাধারণ এবং অজ্ঞ লোকদের জন্যও কোন 'আলিমের তাকলীদ বা অন্ধ অনুকরণ বৈধ গণ্য করতেন না। তাঁর মতে অজ্ঞ ও সাধারণ লোকেরা শুধুমাত্র কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে 'আলিম ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করতেন এবং তিনি কুরআন-সুন্নাহর দলীল যা জানতেন, তার আলোকে ফাতওয়া দিতেন। এটা কোন তাকলীদ ছিলনা, বরং এটা ছিল কোন বিষয়ে আল্লাহর হুকুম কী এবং শারী'আতের দলীল কী তা জানতে চাওয়া। কারণ তাকলীদ হলো রিওয়ায়াতের ভিত্তিতে 'আমল না করে কোন ব্যক্তির রায় বা ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে 'আমল করার নাম । فاسألوا اهل الذكر 'তোমরা জ্ঞানবান ব্যক্তিদের নিকট জিজ্ঞেস কর' এ আয়াত দ্বারা সাধারণ ও অজ্ঞ লোকদের তাকলীদ বৈধ হওয়ার পক্ষে যে

---

১৬৮. প্রাগুক্ত।
১৬৯. প্রাগুক্ত।

দলীল দেয়া হয়, আশ্ শাওকানীর মতে তা সঠিক নয়। কারণ এখানে জিজ্ঞেস করা বলতে বুঝানো হয়েছে কোন বিষয়ে আল্লাহর হুকুম কী সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করাকে, এর দ্বারা কারো তাকলীদ করাকে বুঝানো হয়নি।[১৭০]

তাওয়াসসুল[১৭১] বা সৃষ্টির শরণাপন্ন হওয়া

---

১৭০. মুহাম্মাদ 'আব্দুহু, আল মানার, খ. ৭, পৃ. ২০৬-২০৭।

১৭১. التوسل (আত্ তাওয়াস্সুল) শব্দটি وسل (ওয়াসলুন) শব্দমূল থেকে নিষ্পন্ন। এর অন্য একটি শব্দরূপ হলো الوسيلة (আল্ ওয়াসিলা:) এ শব্দের অর্থ হলো ما يتقرب به الي الغير "যার সাহায্যে অন্যের নৈকট্য লাভ করা যায়।" وسل الي الله بعمل او وسيلة- عمل عملا تقرب به اليه تعالي "আল্লাহর প্রতি ওয়াসিলা করল অর্থ এমন 'আমল করল, যার সাহায্যে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়।" (লুইস মা'লুফ, আল মুনজিদ, ৫ম সংস্করণ, পৃ. ৯০০)
আল্লাহ তা'আলা বলেন, ياايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة و جاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون "হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তার নৈকট্য অন্বেষণ কর এবং তাঁর পথে জিহাদ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (সূরা আল্ মায়িদা :৩৫) তাফসীরে খাযিন এ ওয়াসিলার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আনুগত্য ও সন্তোষ অর্জনকারী 'আমলের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ কর। এ ব্যাখ্যার যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে বলা হয়েছে, কেননা সমগ্র 'আমল দুই শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ।
এর কোন তৃতীয় রূপ নেই। একটি শ্রেণী হলো নিষিদ্ধ কাজসমূহ বর্জন করা। আয়াতে 'আল্লাহকে ভয় কর' কথার দ্বারা এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণী হলো আনুগত্য ও 'আমলের সাহায্যে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। "তাঁর নৈকট্য (ওয়াসিলা) অন্বেষণ কর" আয়াতাংশ দ্বারা এ দিকেই ইশারা করা হয়েছে। উক্ত তাফসীরে الوسيلة শব্দের অর্থ করা হয়েছে, وسل اليه اذا تقرب اليه "তার দিকে ওয়াসিলা করল অর্থাৎ তার নৈকট্য লাভ করল।" কারো কারো মতে الوسيلة শব্দের অর্থ হলো ভালবাসা। তখন আয়াতাংশের অর্থ হবে , "তোমরা আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা অন্বেষণ কর।" ('আলাউদ্দীন 'আলী ইবন মুহাম্মাদ আল খাযিন, তাফসীরুল খাযিন (লাহোর: নো'মানী কুতুবখানা, তা.বি) খ. ১, পৃ. ৪৯১।
'আল্লামা মাহমুদ আলুসী এবং ইমাম আবু স'উদ ওয়াসিলার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,
ما يتوسل به و يتقرب الي الله بترك المعاصي و فعل الطاعات
"নাফরমানী বর্জন ও আদেশ পালনের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও তাঁর নৈকট্য লাভের উপায়কে ওয়াসিলা বলা হয়।" (জালাল উদ্দীন, 'আল্লামা শাওকানী 'আবকারিয়্যাতুহু ওয়া মানহাজুহু ফি তাফসীরিহি, পৃ. ১৫৩)
وسيلة শব্দের আরেক অর্থ সংযোগ স্থাপন করা। ওয়াসিলা ঐ বস্তুকে বলা হয়, যা একজনকে অপরজনের সাথে আগ্রহ ও সম্প্রীতি সহকারে সংযুক্ত করে দেয়। ওয়াসিলা শব্দটির সম্পর্ক আল্লাহর সাথে হলে ঐ বস্তুকে বলা হবে, যা বান্দাকে আগ্রহ ও মুহাব্বাত সহকারে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। তাই পূর্ববর্তী মনীষী, সাহাবী ও তাবি'ঈগণ 'ইবাদাত, নৈকট্য, ঈমান ও সৎকর্ম দ্বারা আয়াতে উল্লেখিত ওয়াসিলা শব্দের তাফসীর করেছেন। হযরত হুযাইফা (রা.), ইবন জারীর, 'আতা, মুজাহিদ ও হাসান বাসরী (রাহ.) বলেন, ওয়াসিলা শব্দ দ্বারা নৈকট্য ও আনুগত্য বুঝানো হয়েছে। উল্লেখিত আয়াতের তাফসীরে হযরত কাতাদা (রহ.) বলেন, تقربوا اليه بطاعته والعمل بما يرضيه "আল্লাহর নৈকট্য অর্জন কর তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টির কাজ করে।" অতএব সার ব্যাখ্যা এই দাঁড়ায় যে, ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অন্বেষণ কর। (মুফতী মুহাম্মাদ শাফী, বঙ্গানুবাদ ও সমম্পাদনা মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, পৃ. ৩২৬-৩২৭)

বিপদাপদে সৃষ্টির শরণাপন্ন হওয়া অর্থাৎ বিপদের সময় নবী, ওয়ালী বা অন্য কোন সাধু-সজ্জন ব্যক্তি অথবা ফেরেশতাদেরকে ডাকা বা তাদের নিকট সাহায্য চাওয়া 'আল্লামা আশ্ শাওকানীর নিকট বৈধ নয়। তিনি এটি শিরক ও গর্হিত কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। সূরা ইউনুস এর ৪৯ নং আয়াত:

قل لا املك لنفسي ضرا و لا نفعا الا ما شاء الله "বলে দিন(হে নবী), আমি আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত নিজের কল্যাণ বা অকল্যাণের কোন অধিকারী নই।" এর ব্যাখ্যায় 'আল্লামা আশ্ শাওকানী বলেন, "আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ বিপদাপদ দূরীভূত করার ক্ষমতার অধিকারী না হওয়া সত্বেও যারা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ডাকা ও বিপদের সময় তাঁর নিকট ফরিয়াদ করাকে বৈধ মনে করে, তাদের জন্য এ আয়াতে উপদেশ ও কঠোর ধমক রয়েছে। অনুরূপভাবে এখানে তাদের জন্যও ধমক রয়েছে, যারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এমন কিছু প্রার্থনা করে, যা দেওয়ার ক্ষমতা রাসূলের নেই, বরং শুধু আল্লাহরই রয়েছে । কেননা এটা শুধু সকল জাহানের রব আল্লাহর জন্যই মানানসই, যিনি নবীগণকে, সাধু-সজ্জন ব্যক্তিবর্গ ও সকল সৃষ্টকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে উপজীবিকা সরবরাহ করেন এবং জীবন ও মৃত্যু দান করেন।

সকল বিষয়ের উপর সর্ব শক্তিমান, স্রষ্টা, রিযকদাতা, দানকারী ও বারণকারী মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা না করে, যারা প্রয়োজন পূরনে অক্ষম ও অপারগ, সে সকল নবী, ফেরেশতা ও সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের নিকট প্রার্থনা কিভাবে বৈধ হতে পারে? তোমার উপদেশ গ্রহণের জন্য এ আয়াতই যথেষ্ট। কারণ মানব জাতির নেতা, সর্বশেষ রাসূলকে আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন তাঁর বান্দাদেরকে বলে দেন, 'আমি আমার নিজের ভাল-মন্দেরও মালিক নই, তাহলে তিনি কি করে অন্যের ভাল-মন্দের মালিক হতে পারেন ? তিনি ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তি, যাদের মর্যাদা ও স্থান তাঁর মত নয় তারা কি করে এর মালিক হতে পারে? সে সম্প্রদায়ের জন্য বিস্ময় যারা মাটির নিচে অবস্থিত মৃত ব্যক্তির কবরের নিকট গিয়ে প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রার্থনা করে, অথচ তারা প্রয়োজন পূরণের মালিক নয়; বরং এর মালিক হলেন একমাত্র আল্লাহ। তারা যে এর মাধ্যমে শিরকে লিপ্ত রয়েছে, সে ব্যাপারে কেন তারা সচেতন হয় না ? কেন তারা সতর্ক হয় না যে তারা যা করছে, তা لا اله الا الله (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই) এ কথার বিপরীত এবং قل هو الله احد (বলুন, আল্লাহ হলেন এক ও একক) আয়াতের দাবীর পরিপন্থী?

এর চেয়েও অধিক আশ্চর্যের বিষয় হলো সে সকল 'আলিমের বিষয়, যারা এগুলো

সংঘটিত হতে দেখেও তাদেরকে বাধা দেয়না, পুরাতন জাহিলিয়াতের বা তার চেয়েও কঠিন জাহিলিয়াতের দিকে ফিরে যেতে দেখেও তাদেরকে বারণ করে না। এটি পুরাতন জাহিলিয়াতের চেয়েও জঘন্যতর এ কারণে যে, তারা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, রিযকদাতা, জীবন দানকারী, মৃত্যুদানকারী এবং অনিষ্ট ও কল্যাণের অধিকারী বলে স্বীকার করত। তারা মূর্তিগুলোকে আল্লাহর নিকট তাদের জন্য সুপারিশকারী ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম নির্ধারণ করত। কিন্তু এরা তাদেরকে (কবরবাসীকে) ভাল-মন্দের ক্ষমতার অধিকারী মনে করে কখনো তাদেরকে স্বতন্ত্রভাবে ডাকে, আবার কখনো বা আল্লাহর সঙ্গে তাদেরকে ডাকে (শরীক করে)।[১৭২]

নবী, ওয়ালী, সালফে সালেহীন প্রমুখের প্রতি অতি ভক্তি বহু লোককে বিভ্রান্ত করেছে। তাদেরকে ওয়াসীলা করে বহু শিরক ও বিদ'আতের প্রচলন হয়েছে। মূর্তি পূজার সূচনাও হয়েছে এ ভ্রান্ত চিন্তা ও ভক্তি থেকেই। বর্তমান যুগের কবর পূজা, মাজার পূজা এবং এগুলোকে কেন্দ্র করে যত শিরক ও বিদ'আত সমাজে প্রচলিত হয়েছে তার উৎসও এটিই। 'আল্লামা আশ্ শাওকানী এর ভিত্তিমূলে আঘাত করেছেন। তিনি এ সকল ভ্রান্ত কর্মকান্ড থেকে উম্মাহকে সতর্ক করেছেন এবং উম্মাহর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি 'আলিমগণকে সতর্ক করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

মুতাশাবিহ (দ্ব্যর্থ বোধক) আয়াতের ক্ষেত্রে আশ্ শাওকানীর নীতি

কুরআন কারীমের যে সকল আয়াত দ্ব্যর্থ বোধক, অস্পষ্ট বা সাদৃশ্যপূর্ণ সে গুলোকে মুতাশাবিহ বলা হয়।[১৭৩] "তাঁর সিংহাসন সমস্ত আকাশ ও যমীনকে পরিব্যাপ্ত করে

---

১৭২. আয যাহাবী, প্রাগুক্ত, প্র, ২৫৬-২৫৬।

১৭৩. কুরআনের আয়াতগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১. মুহকাম ২. মুতাশাবিহ। এ প্রসঙ্গে সূরা আলে 'ইমরানের ৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে

هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمة هن ام الكتاب و اخر متشابهات ط فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله

"তিনিই সেই সত্তা, যিনি আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যার কতক আয়াত মুহকাম, সেগুলোই হলো কিতাবের মূলাধার; আর কতকগুলো হলো মুতাশাবিহ্। যাদের অন্তরে রয়েছে বক্রতা, তারা বিপর্যয় ঘটানোর মতলবে এবং অসঙ্গত তাৎপর্য বের করার উদ্দেশ্যে তন্মধ্য হতে মুতাশাবিহ্ আয়াতগুলোর অনুসরণ করে থাকে।"

মুহকাম ও মুতাশাবিহ্ আয়াতের পরিচয় ঃ মুহকাম এর অর্থ সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন, সুদৃঢ়, যার অর্থ বুঝতে কোন সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হয় না। আর মুতাশাবিহ এর অর্থ হলো দ্ব্যর্থ বোধক, অস্পষ্ট ও ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। এ প্রসঙ্গে আবুল কাসিম আল হুসাইন ইবন মুহাম্মাদ (রাগিব ইসফাহানী) বলেন, فالمحكم الذي ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ و لا من حيث المعني

"মুহকাম হলো সে সকল আয়াত যে গুলোতে শব্দের বা অর্থের কোন দিক দিয়ে সন্দেহ-সংশয় উপস্থিত হতে পাবে না।"

و التاشبه من القران ما اشكل تفسيره لمشابهته بغيره اما من حيث اللفظ او من حيث المعني

"শব্দের বা অর্থের দিক দিয়ে অন্যের সাথে সাদৃশ্য থাকার কারণে যে বিষয়ে ব্যাখ্যা করা দুষ্কর বোধ হয়, সেগুলোই হচ্ছে কুরআনের মুতাশাবিহ। (রাগিব ইস্ফাহানী)।

ইমাম ইবন জারীর বলেন, اما المحكمات فانهن اللواتي قد احكمن بالبيان و التفصيل
"যে আয়াতগুলো বিশদভাবে বর্ণনার মাধ্যমে সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় করা হয়েছে, সেগুলোই হলো মুহকাম।

اما متشابهات فان معناه متشابهات في التلاوة مختلفات في المعني "যে গুলোর তিলাওয়াত বা পঠনে কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে পরস্পরে পার্থক্য রয়েছে, মুতাশাবিহাত বলতে সে গুলোকেই বুঝায়।" (তাফসীরে তাবারী, খ. ৩, পৃ. ১১৩-১১৪)
হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইসমা'ঈল ইবন কাছীর বলেন,

يخبر تعالي أن في القرأن ايات محكمات هن ام الكتاب أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها علي احد
"আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, কুরআনের কতক আয়াত হচ্ছে মুহকাম, যেগুলো হলো কুরআনোর মা বা মূলাধার। অর্থাৎ যেগুলো বর্ণিত হয়েছে সুস্পষ্টভাবে এবং যেগুলোর প্রতিপাদ্য নির্ধারণে কাউকে কোন সন্দেহে পড়তে হয় না।"
"এবং তার অন্য কতকগুলো আয়াত রয়েছে যার প্রতিপাদ্য বুঝতে বহু লোকের বা কতক লোকের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। (তাফসীরুর কুরআনিল আজীম (মিশর ঃ দারুল কুতুব তা বি) খ. পৃ, ৩৪৪)
ইমাম শাফি'ঈ বলেন, المحكم ما لا يحتمل من التأويل الا وجها واحدا "একটি মাত্র তাৎপর্য ব্যতীত অন্য কোন তাৎপর্যের সম্ভাবনা থাকেনা যাতে, তাই হলো মুহকাম।" و المتشابه ما احتمل من التأويل وجوها "পক্ষান্তরে একাধিক তাৎপর্য গ্রহণ করার সম্ভাবনা থাকতে পারে যাতে, সেগুলো হচ্ছে মুতাশাবিহ।"
(মুফতি মুহাম্মাদ আব্দুহু, আল মানার, খ. ৩, পৃ, ১৯০; আলাউদ্দীন আলী ইবন মুহাম্মাদ আল খাযিন, তাফসীরুল খাযিন, (লাহোর ঃ নু'মানী কুতুবখানা, তা. বি) খ. ১, পৃ. ২৩০)
ইমাম আহমাদ বলেন, المحكم ما استقل بنفسه و لم يحتج الي بيان "যেগুলো স্বত:সম্পূর্ণ ও অন্য নিরপেক্ষ এবং যেগুলোর তাৎপর্য অন্য ব্যাখ্যা সাপেক্ষ নয়, সেগুলো হচ্ছে মুহকাম।"
و المتشابه ما احتج الي بيان "পক্ষান্তরে যেগুলো ব্যাখ্যা সাপেক্ষ, সেগুলোই হলো মুতাশাবিহ।"
(মাওলানা আকরাম খাঁ, বাংলা তাফসীর (ঢাকা ঃ ঝিনুক পুস্তিকা) খ. ১. পৃ. ৩৭০)
আল্লামা আলাউদ্দীন আলী ইবন মুহাম্মাদ আল খাযিন বলেন, محكمات يعني مبينات مفصلات أحكمت عبارتها من احتمال التأويل و الاشتباه "মুহকাম অর্থ হলো বিশদভাবে বর্ণিত ও সুস্পষ্ট, যা বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও সন্দেহ- সংশয় হতে সুরক্ষিত।" متشابهات يعني لفظه يشبه لفظ غيره و معناه يخالف معناه "মুতাশাবিহাত অর্থ হলো, যে শব্দ অন্য শব্দের মতই, কিন্তু তার অর্থ ভিন্ন ।" (তাফসীরুল খাযিন, প্রাগুক্ত)
মুতাশাবিহ আয়াতগুলোর অর্থ দ্ব্যর্থবোধক, অস্পষ্ট ও ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হওয়ায় বক্র হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ ফিৎনা-ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইচ্ছামত এগুলোর ব্যাখ্যা করে থাকে। কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, এগুলোর বাহ্যিক অর্থের পরিবর্তে ভাবার্থ, রূপক অর্থ ও অন্তর্নিহিত অর্থ গ্রহণ করতে হবে। আর সে অর্থ গ্রহণ করতে হবে মুহকাম আয়াতের আলোকে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবন কাছীর বলেন ,

فمن رد ما اشتبه الي الواضح منه و حكم محكمه علي متشابهه عنده فقد اهتدي و من عكس العكس
"যে ব্যক্তি সন্দেহ-সংশয় যুক্ত (মুতাশাবিহাত) বিষয়কে সুস্পষ্ট বর্ণনার সাথে মিলিয়ে নেয় এবং মুহ্কাম আয়াতগুলোার সাথে সন্দেহের বিষয়গুলো যাচাই বাছাই করে নেয়, তাহলে সে সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে। কিন্তু এর উল্টা করবে যে ব্যক্তি, সে হবে বিপথের যাত্রী।" (ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত)
এ ব্যাপারে মুফতি মুহাম্মাদ শাফী বলেন, " দ্বিতীয় প্রকার আয়াত (মুতাশাবিহ আয়াত) অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট হওয়ার কারণে এগুলো সম্পর্কে বিশুদ্ধ পন্থা এই যে, এসব আয়াতকে প্রথম প্রকার (মুহকাম) আয়াতের আলোকে দেখতে হবে। যে অর্থ প্রথম প্রকার আয়াতের বিপক্ষে যায়, তাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে বক্তার এমন উদ্দেশ্য বুঝতে হবে, যা প্রথম প্রকার আয়াতের বিপক্ষে নয়।" (মা'আরিফুল কুরআন, বঙ্গানুবাদ, বাদশা ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, পৃ, ১৬৪)

আছে।" এর ব্যাখ্যায় আশ্ শাওকানী বলেন, কুরসীর বাহ্যিক অর্থ হলো এমন অবয়ব যার গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে প্রমাণাদি এসেছে যার বর্ণনা শীঘ্রই আসবে। অথচ একদল মু'তাযিলা তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। বস্তুত: তারা সুস্পষ্ট ভুল ও জঘণ্য ভ্রান্তিতে লিপ্ত। পূর্ববর্তীদের কেউ কেউ কুরসী বলতে জ্ঞানকে বুঝিয়েছেন। ইবন জারীর এ মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেন কুরসী হলো শক্তি যার দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা আসমানসমূহ ও যমীনকে করায়ত্ব করে রেখেছেন। অনেকেই কুরসীর অর্থ করেছেন আরশ। আবার কেউ কেউ বলেন এটি হলো রাজত্ব। তবে সঠিক কথা হলো প্রথমটি। কারণ শুধু মাত্র কল্পনা ও ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে এর প্রকৃত অর্থ থেকে অন্য দিকে পরিবর্তিত করার কোন সুযোগ নেই।"[১৭৪]

অনুরূপ ভাবে সূরা আল আ'রাফের ৫৪ নং আয়াতে

ان ربكم الله الذى خلق السموات والا رض فى ستة ايام ثم استوى على العرش

"নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রভু আল্লাহ হলেন তিনি, যিনি আকাশসমূহ ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন।" এর ব্যাখ্যায় 'আলিমগণ ১৪টি মতে বিভক্ত হয়েছেন। কিন্তু সবচেয়ে মানানসই ও সঠিক অর্থ সেটিই যেটি 'সালফে সালিহীন' করেছেন। আর তা হলো, আল্লাহ 'আরশে সমাসীন হয়েছেন, তবে কিভাবে তা অজ্ঞাত, বরং তিনি সমাসীন হয়েছেন সেভাবে, যা তাঁর জন্য উপযোগী ও মানানসই এবং যা তাঁর জন্য বেমানান, তা থেকে মুক্ত ও পবিত্র অবস্থায়।"[১৭৫]

শহীদগণ জীবিত এবং তাদের প্রভুর নিকট হতে জীবিকা প্রাপ্ত হয়। এ ব্যাপারে সূরা আলে ইমরানের ১৬৯ নং আয়াত- ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون 'যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিতাবস্থায় তাদের প্রভুর নিকট উপজীবিকা প্রাপ্ত।' এর তাফসীর করতে দিয়ে আশ্ শাওকানী বলেন, জামহুর (মুফাসসিরীন) এর মতে তাঁরা প্রকৃত ও বাস্তবিক পক্ষেই জীবিত (তবে কোথায় কিভাবে জীবিত রয়েছে) সে ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাদের কেউ বলেন, কবরে তাঁদের নিকট তাঁদের রূহকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। ফলে তাঁরা জান্নাতের নি'আমত উপভোগ করতে পারেন। মুজাহিদ বলেন, তাঁরা জান্নাতের ফল ভোগ করেন। অর্থাৎ জান্নাতের ঘ্রাণ পান। তবে তাঁরা তার ভেতরে নন। জমহুর ব্যতীত অন্যদের মতে তাঁদের জীবন হলো রূপক অর্থে অর্থাৎ তারা আল্লাহর হুকুমে জান্নাতের নি'আমতের অধিকারী। তবে এ ক্ষেত্রে সঠিক মত হলো প্রথমটি। কারণ এখানে রূপক অর্থের দিকে প্রত্যাবর্তনের কোন সুযোগ নেই। কেননা হাদীস

---

১৭৪. আয্ যাহাবী, আত্ তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন, খ. ২, পৃ. ২৫৭-২৫৮।
১৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮।

শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের রূহ সবুজ পাখির উদরে থেকে জান্নাতের উপাজীবিকা ভক্ষণ ও ভোগ-বিলাসে লিপ্ত থাকে ।[১৭৬]

ফিকহ্ এর ক্ষেত্রে আশ্ শাওকানীর নীতি

'আল্লামা আশ্ শাওকানী একজন মুজতাহিদ ছিলেন। তিনি নির্দিষ্ট কোন ইমাম বা মাযহাবের তাকলীদকে সমর্থন করতেন না। ফিকহী মাসয়ালার ক্ষেত্রে তাঁর মূলনীতি ছিল কুরআন সুন্নাহর দলীলের আলোকে যাচাই বাছাই করা। দলীল প্রমাণের দ্বারা যেটি সঠিক বলে প্রমাণিত হতো সেটিকেই গ্রহণ করতেন। সেটি কোন্ মাযহাবের বা ইমামের পক্ষে বা বিপক্ষে তা তিনি দেখতেন না। তাঁর মতে মাসয়ালা চয়ন করতে হবে দলীলের ভিত্তিতে। দলীল প্রমাণ ব্যতীত অন্ধ অনুকরণের ভিত্তিতে মাসয়ালা চয়নকে তিনি অগ্রহণযোগ্য মনে করতেন। এব্যাপারে তিনি আস্সায়লুল জারার আল মুদাফফিক আল হাদাইকিল আযহার নামক একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন।

এ গ্রন্থে তিনি মাসয়ালা মাসায়িল চয়নের মূলনীতি সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর মূল বক্তব্য হলো মাসয়ালা অবশ্যই দলীল দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। যা দলীল সমর্থিত নয় তা গ্রহণযোগ্য নয়।

তিনি নিন্দিত তাকলীদকে পরিহার করে দলীলের দিকে মনোনিবেশ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি হানাফী, শাফিঈ বা অন্য কোন মাযহাবের ফিকহী কোন মাসয়ালা পেলে তাকে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা' দ্বারা পরখ করে যেটিকে সঠিক পেতেন, সেটিকেই গ্রহণ করতেন। ফিকহের ক্ষেত্রে এটিই ছিল তাঁর অবলম্বিত নীতি।[১৭৭]

---

১৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬। হাদীছটির পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা নিম্নরূপ :'মাসরূক (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রাজিয়াল্লাহু 'আনহু) কে 'যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত বলোনা বরং তারা জীবিত, তারা তাদের রবের নিকট জীবিকা পায়' এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, তাদের রূহসমূহ সবুজ পাখির উদরে থাকে, যা আরশের সাথে ঝুলানো একটি পিঞ্জিরায় অবস্থান করে। সেখান থেকে জান্নাতের যেথায় খুশি ভ্রমণ করে। অতঃপর আবার সে পিঞ্জিরায় ফিরে আসে। অতঃপর আল্লাহ তাদের দিকে দৃষ্টি দেন এবং বলেন, তোমরা কি কিছু চাও? তারা বলবে, আমরা আর কি চাব? আমরা তো জান্নাতের যেথায় ইচ্ছা ঘুরে বেড়াচ্ছি। আল্লাহ তাদেরকে তিনবার জিজ্ঞেস করবেন। তারা (শহীদরা) যখন দেখবেন যে, কোন কিছু না চাওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে ছাড়বেন না, তখন তারা বলবে, হে আমাদের রব, আমরা চাই আমাদের রূহসমূহকে আমাদের দেহে ফিরে দেয়া হোক, যাতে আমরা আবার আপনার রাস্তায় নিহত হতে পারি। আল্লাহ যখন দেখবেন যে, তাদের আর কোন চাওয়া পাওয়া নেই, তখন তাদেরকে ছেড়ে দেবেন। (ওয়ালিউদ্দীন মুহাম্মাদ , মিশকাতুল মাসাবীহ্ কিতাবুল জিহাদ, আল ফাসলুল আওয়াল মুসলিমের উদ্ধৃতিতে ইবনুল কায়্যিম , যাদুল মাআদ, খ.২ ফাসলু ফাজজলুল শাহীদ ওয়া মাযিয়াতুশ শাহাদাত)

১৭৭. জালালউদ্দিন প্রাগুক্ত পৃ. ২৩-২৪।

'আল্লামা আশ্ শাওকানীর 'আকীদা

'আকীদা-বিশ্বাস একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোন ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা ও কর্মকান্ড তাঁর 'আকীদা বিশ্বাসের ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। মূলতঃ 'আকিদার প্রতিফলনই কর্মকান্ডে প্রতিফলিত হয়। 'আকীদা-বিশ্বাসের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতার উপর 'আমল গৃহীত হওয়া না হওয়া নির্ভরশীল। প্রকৃত পক্ষে 'আকীদা-বিশ্বাসেরই অপর নাম হলো ঈমান। কারণ সন্দেহ-সংশয় মুক্ত অকাট্য বিশ্বাসের নামই 'আকীদা। ঈমানও এরই সমার্থক। 'আল্লামা আশ্ শাওকানী একজন স্বচ্ছ ও সঠিক চিন্তার অধিকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কুরআন-সুন্নাহর সঠিক নির্দেশনা গ্রহণ ও বিশুদ্ধ চিন্তার অধিকারী হওয়ায় তাঁর 'আকীদাও ছিল নির্ভুল।

তিনি ছিলেন আহলে সুন্নাহ ওয়ালা জামা'আতের সালফে সালেহীন এর 'আকীদা-বিশ্বাসের ধারক ও বাহক। বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর 'আকীদা বিশ্বাসের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, "আশ্ শাওকানীর 'আকীদা ছিল সালফে সালেহীনের 'আকীদার অনুরূপ। বিশেষতঃ আল্লাহ তা'আলার সিফাত, (গুণাবলী) কুরআন ও সহীহ সুন্নাহতে যেভাবে এসেছে কোন প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধন ছাড়াই হুবহু (শাব্দিক অর্থে) সেভাবেই গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি 'আত্ তাহফু বি-মাযহাবিস সালফ' নামক একটি গ্রন্থও রচনা করেছেন।"[১৭৮]

যায়দিয়া মাযহাব ও আশ্ শাওকানী

প্রথম দিকে তিনি যায়দিয়া মাযহাবের অনুসরণ করলেও তাঁর 'আকীদা-বিশ্বাসে ছিল আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের 'আকীদা বিশ্বাস। নির্ভুল চিন্তা ও সঠিক 'আকীদা-বিশ্বাসের অনুসারী ছিলেন বলেই তিনি যায়দিয়া মাযহাব পরিত্যাগ করেন। যায়দিয়া মাযহাব পরিত্যাগ করা স্বত্ত্বেও অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধে যায়দিয়া মাযহাবের অনুসারী হওয়ার অভিযোগ আরোপ করেন। এর কারণ তিনি যায়দিয়াদের প্রসিদ্ধ 'আলিম ও রাজনৈতিক নেতা আহমাদ ইবন ইয়াহ্ইয়া আল মাহদীর গ্রন্থ "আল আযহার" এর শরাহ (ব্যাখ্যা) লেখেন এবং তার নাম দেন "আস্ সায়লুল জারার আল্ মুদাফ্ফিক 'আলা হাদাইকিল আযহার"। কিন্তু এ অভিযোগ একবারেই ভিত্তিহীন। কেননা এ শরাহ লিখতে গিয়ে তিনি সর্বদাই সুন্নাহর সাথে যুক্ত থেকেছেন এবং যায়দিয়াদের বিদ'আত থেকে সুস্পষ্টভাবে দূরে অবস্থান করেছেন। এ গ্রন্থের যেখানেই তিনি সুন্নাহর বিরোধিতা ও বিদ'আতের অনুসরণ লক্ষ্য করেছেন, সেখানেই তিনি তার প্রতিবাদ করেছেন এবং কুরআন-সুন্নাহর সঠিক নির্দেশিকা তুলে ধরেছেন।

এ প্রসঙ্গে 'আব্দুল হাকীম কাজীর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "একদা আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষকের সাথে এক বৈঠকে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন,

---

১৭৮. আয্ যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯; শাওকানী, নাইলুল আওতার, ভূমিকা।

আশ্ শাওকানী তো যায়দী ছিলেন। আমি বললাম, তিনি যে যায়দী ছিলেন তার প্রমাণ কি? তিনি বললেন, যায়দিয়াদের কিতার আল আযহার এর শরাহ্ লেখাই এর প্রকৃষ্টতম প্রমাণ; কারণ আল আযহার হলো যায়দিয়াদের গ্রন্থ। আমি বললাম, এ গ্রন্থই তাঁর সুন্নী ও সালফী হওয়ার প্রমাণ। বস্তুতঃ যায়দিয়াদেও মধ্যে বেড়ে উঠা ব্যতীত যায়দী হওয়ার আর কোন পরিচয় তার মধ্যে পাওয়া যায়না। আপনি যদি আল আযহার গ্রন্থের ফিকহী মাসয়ালাসমূহ অনুসন্ধান করে দেখেন, তাহলে সেখানে যায়দিয়াদের চিন্তাধারা এবং আশ্ শাওকানীর শরাহ্র মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা থেকেই আমার কথার সত্যতা পেয়ে যাবেন। উদাহরণস্বরূপ আল আযহার গ্রন্থের নিম্নলিখিত মাসয়ালাটি দেখা যেতে পারে। আল আযহার গ্রন্থের লেখক জানাযার অধ্যায়ে ফি মকরূহাতিল কুবুর পরিচ্ছেদে বলেন, "মর্যাদাবান ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো কবর উঁচু করা মাকরূহ্। অর্থাৎ কবর উঁচু করা মাকরূহ। তবে যদি কোন ব্যক্তি মর্যাদাশালী ও নেতৃস্থানীয় হয়, তাহলে তার কবর উঁচু করা মাকরূহ্ নয়; বরং জায়িয। সাধারণভাবে শী'আ মাযহাবের মূলনীতির উপর ভিত্তি করে এটি প্রচলিত হয়েছে।"এর ব্যাখ্যায় আশ্ শাওকানী বলেন, "এটা মূলতঃ সংশ্লিষ্ট লোকদের এক ধরনের প্রতারণা। বিশেষতঃ শাসক ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে যারা তাদের কবরসমূহকে উঁচু করে এবং তার উপর গম্বুজ নির্মাণ করে। এটা বিশুদ্ধ ও প্রমাণিত দলীল দ্বারা হারাম। এটি সহীহ্ (বুখারী) ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে বহু সূত্রে বর্ণিত হওয়ায় 'ইলমে ইয়াকীন (নিশ্চিত জ্ঞান) কে আবশ্যক করে।" এমনকি তিনি বলেন, হায়! আমি বুঝতে পারিনা যে, বিশিষ্টজনদের কবর উঁচু করার কি কারণ থাকতে পারে? কেননা, অন্যদের চেয়ে তাদের কবরের ক্ষেত্রে সুন্নাহর অনুসরণ করা এবং শারী'আত লোকদের জন্য যা হারাম করেছে, তা বর্জন করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত।"[১৭৯]

এ গ্রন্থে আশ্ শাওকানী যেখানেই যায়দিয়াদের ভ্রান্ত 'আকীদা, ভুল মাসয়ালা ও বিদ'আতের সন্ধান পেয়েছেন, সেখানে তার প্রতিবাদ করেছেন এবং কুরআন-সুন্নাহর আলোকে যা সঠিক তা উপস্থাপন করেছেন।

সুতরাং এ গ্রন্থের শরাহ্ লেখা তাঁর যায়দিয়া হওয়ার প্রমাণ নয়; বরং এর বিপরীত তাঁর সুন্নী ও সালফী হওয়ারই প্রমাণ।

মু'তাযিলা 'আকীদা ও আশ্ শাওকানী

মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের সঙ্গে যায়দিয়া সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য ও সংযোগ সুস্পষ্ট। যায়দিয়াদের ইমাম যায়িদ ইবন 'আলীর উক্তি বহু ক্ষেত্রে মু'তাযিলাদের সঙ্গে মিলে গিয়েছে।[১৮০] মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা ও যায়দিয়াদের চিন্তাধারার মধ্যকার

---

১৭৯. আশ্ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, খ. ১, পৃ. ১৫ (আস্ সায়লুল জারার, খ. ১, পৃ. ৩৬৭-৩৬৮ এ উদ্ধৃতিতে)

১৮০. প্রাগুক্ত।

সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন। 'আল্লামা আশ্ শাওকানী যায়দিয়াদের মধ্যে বেড়ে উঠা সত্ত্বেও মু'তাযিলাদের চিন্তার দ্বারা সামান্যতমও প্রভাবিত হননি। বরং তিনি ছিলেন এর কট্টর সমালোচক ও প্রতিরোধকারী। আশ্ শাওকানী যে মু'তাযিলা চিন্তাধারার বিরোধী ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নলিখিত আয়াতের তাফসীরে। و نودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون "তাদেরকে ডেকে বলা হবে, এটিই সে জান্নাত তোমাদেরকে যার উত্তরাধিকারী করা হয়েছে কর্মের বিনিময়ে।" (আল্ আ'রাফ : ৪৩) মু'তাযিলা চিন্তাধারার অনুসারী 'আল্লামা যামাখশারী তাফসীরে কাশ্শাফে এর ব্যাখ্যা করে বলেন, بما كنتم تعملون এর অর্থ হলো, 'তোমাদের 'আমলের কারণে, কোন প্রকার অনুগ্রহে নয়, যেমন বাতিল পন্থীরা বলে থাকে'। এরপর আশ্ শাওকানী বলেন, "আমি বলি, ওহে মিসকীন, এ কথা (আল্লাহর অনুগ্রহে জান্নাত লাভের কথা) বলেছেন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ব্যাপারে তাঁর থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত রয়েছে,

سددوا و قاربوا و اعملوا إنه لن يدخل احد الجنة بعمله قالوا و لا انت يا رسول الله قال و لا انا إلا ان يتغمدني الله برحمته

"তোমরা সঠিক পথে চল, পরস্পরে মিলে-মিশে থাক এবং 'আমল কর; কেননা শুধু 'আমলের দ্বারা কেউ কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা। সাহাবীগণ বললে, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনিও নন? তিনি বললেন, আমিও নই। তবে আল্লাহ আমাকে স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা আচ্ছাদিত করে রেখেছেন।" যদি 'আমলের জন্য 'আমলকারীর উপর আল্লাহর অনুগ্রহ না থাকত, তাহলে আদৌ কোন 'আমলই হতো না। তাছাড়া কুরআন কারীমে রয়েছে, ذلك الفضل من الله "এটা আল্লাহর পক্ষ হতে অনুগ্রহ"। (আন্ নিসা : ৭০) কুরআনে আরো রয়েছে, فسيدخلهم في رحمة منه و فضل 'শীঘ্রই তিনি তাদেরকে রহমত ও অনুগ্রহে প্রবেশ করাবেন।" (আন্ নিসা : ১৭৫)[১৮১]

সূরা আল বাকারার ৫৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়ও আশ্ শাওকানী মু'তাযিলা মতবাদের বিরোধিতা করেছেন।

و اذا قلتم يا موسي لن نؤمن لك حتي نري الله جهرة فاخذتكم الصاعقة و انتم تنظرون

"আর যখন তোমরা বললে, হে মুসা, আমরা কখখনো তোমাকে বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না আল্লাহকে আমরা প্রকাশ্যভাবে দেখতে পাব। ফলে বিদ্যুৎ তোমাদেরকে পাকড়াও করল, আর তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে।" এর ব্যাখ্যায় 'আল্লামা আশ্ শাওকানী বলেন, "তাদেরকে বিদ্যুৎ দ্বারা পাকড়াও করে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল এ

---

১৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

কারণে যে, তারা এমন বিষয়ের আবদার করেছিল, যে বিষয়ের অনুমোদন আল্লাহ দেননি। আর তা হলো দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখা। মু'তাযিলা এবং তাদের অনুসারীরা দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় স্থানেই আল্লাহকে দেখার বিষয়টি অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে তাদের বিরোধী একদল মনে করে দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় স্থানেই আল্লাহকে দেখা সম্ভব। অথচ সহীহ্ হাদীছসমূহে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, বান্দাগণ তাদের প্রভুকে আখিরাতে দেখতে পাবে। এটি অকাট্যভাবে প্রমাণিত। সুতরাং এর বিপরীতে মু'তাযিলাদের বিবেকপ্রসূত কথাবার্তা ও নীতিমালা গ্রহণের কোন সুযোগ নেই। এটি মূলত: তাদের একটি হটকারী দাবী এবং এমন নীতি যার দ্বারা কেবলমাত্র অজ্ঞ লোকেরাই প্রতারিত হতে পারে।"[১৮২]

এ আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি মু'তাযিলা 'আকীদার বিরোধী ছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

'আল্লামা আশ্ শাওকানীর সংস্কারমূলক কর্মকান্ড

'আল্লামা আশ্ শাওকানীর সময় মুসলিম বিশ্ব ও ইয়ামানের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল, তা আমরা এ গ্রন্থের শুরুতে আলোচনা করেছি। সে সময়ে ইয়ামান ছিল বিভিন্ন মাযহাবের চারণভূমি। বিশেষ করে ভ্রান্ত মতবাদের বিভিন্ন মাযহাব ও ধর্মীয় উপদলের বিভ্রান্তিকর কর্মকান্ড অনেক সাধারণ মুসলিমকে পথভ্রান্ত করে ফেলেছিল। এর মধ্যে শিয়াদের একটি উপদল যায়দিয়া মাযহাব ছিল অন্যতম। এ দলটি ছিল যায়েদ ইবন 'আলী ইবন হুসাইন ইবন আবি তালিবের অনুসারী।

মু'তাযিলা সম্প্রদায়ও এ সময় ইয়ামানে ছিল। তারা ছিল ওয়াসিল ইবন 'আতার অনুসারী। এ ছাড়া আশ'আরীগণও ছিল।

বাতিনী সম্প্রদায় নামে আরো একটি সম্প্রদায় ছিল। তারা নিজেদেরকে শিয়া সম্প্রদায়ভূক্ত বলে দাবী করত। এরা স্থানভেদে কোথাও কারামতিয়া, কোথাও মাযদাকিয়া আবার কোথাও মূলহিদা বলে পরিচিত ছিল। এরা ভেতরে ভেতরে ছিল মূলত: কাফির। এরা কুরআনের দলীলকে অপব্যাখ্যা ও বিকৃত করে তাদের দাবীর পক্ষে ব্যবহার করত। হাদীছকে তারা সন্দেহের চোখে দেখত। তারা কুরআন-সুন্নাহর অপব্যাখ্যা করে তাদের সুবিধামত হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল সাব্যস্ত করত।

তাসাউফের দাবীদার একদল সুফীবাদীও আশ্ শাওকানীর সময়ে ইয়ামানে ছিল। এ শ্রেণীটি তাসাউফের মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল। তাসাউফের মূল উদ্দেশ্য

---

১৮২. ফাতহুল কাদীর, খ. ১, পৃ. ২০১।

হলো হারাম বর্জন, 'ইবাদাতসমূহ সঠিক ও যথাযথভাবে আদায় করা, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধাদান। কিন্তু শাওকানীর সময়ে সুফীবদীরা এর বিপরীত শিরক, বিদ'আত ও শারী'আত বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারা শারী'আতের বিধান থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে নেয় এবং নজর-মান্নতের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির নৈকট্য লাভের চেষ্টা করত। তারা কবর পূজা ও বুযর্গ পূজার মত জঘন্য শিরকে লিপ্ত ছিল। তারা মৃত ব্যক্তির নিকট উপকার ও অপকারের জন্য প্রার্থনা করত এবং এমনকি জীবন-মৃত্যুর জন্যও তাদেরকে মৃত ব্যক্তির নিকট ধর্ণা দিতে দেখা যায়, যা ছিল সম্পূর্ণ ইসলাম বহির্ভূত কাজ।[১৮৩]

'আল্লামা আশ্ শাওকানীর ভূমিকা

আশ্ শাওকানী এ সকল শিরক, বিদ'আত ও ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ান। তিনি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এগুলোর অসারতা ও ভ্রান্তি সুস্পষ্টভাবে মুসলিমদের সামনে তুলে ধরেন এবং জনগণকে এ সকল শারী'আত বিরোধী গর্হিত কাজ বর্জনের আহবান জানান। তিনি তাসাউফের বিভ্রান্তি থেকে মুসলিমদেরকে সতর্ক করার জন্য প্রকৃত তাসাউফ ও প্রচলিত ভ্রান্ত তাসাউফের পার্থক্য তুলে ধরে 'কাতরুল ওয়ালী' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন।[১৮৪]

আশ্ শাওকানীর এ সংস্কার ও সংশোধনমূলক কর্মসূচীর ডাকে অনেক 'আলিম সাড়া দেন। তাঁরাও তাঁদের ক্ষুরধার লিখনীর মাধ্যমে প্রচলিত ভ্রান্ত মতবাদের অপকর্ম প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন এবং আল্লাহর প্রকৃত দ্বীনের মধ্যে যে ভ্রান্তি অনুপ্রবেশ করেছিল তা বিদূরিত করতে সচেষ্ট হন। এভাবে আশ্ শাওকানীর কর্মসূচীর মাধ্যমে ইয়ামানে এক 'ইলমী' (বুদ্ধিবৃত্তিক) আন্দোলনের সূচনা হয়।

শাওকানী কখনো তা'লীমের মাধ্যমে, কখনো ফাতওয়া দানের মাধ্যমে এবং কখনো বা হুকুম জারীর মাধ্যমে এ সকল অবাধ্য সম্প্রদায়কে প্রতিহত করেন।[১৮৫]

শত ব্যস্ততার মাঝেও আশ্ শাওকানী সুযোগ পেলেই কলম ধরতেন এবং লিখতেন। গবেষণার মাধ্যমে তিনি উম্মাহর জন্য শারী'আর প্রকৃত বিষয়াবলী এবং প্রকৃত দ্বীনকে তার আসলরূপে জনসমক্ষে উপস্থাপন করতেন এবং সরল-সঠিক পথে চলার আহবান জানাতেন।[১৮৬]

এ কারণেই অনেকে তাকে ইয়ামানের মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

---

১৮৩. আশ্ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, খ. ১, পৃ. ৯-১১।
১৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।
১৮৫. প্রাগুক্ত
১৮৬. প্রাগুক্ত

'আল্লামা আশ্ শাওকানী মুজাদ্দিদ ছিলেন কিনা

'আল্লামা আশ্ শাওকানী একজন উঁচু মাপের মুজতাহিদ (গবেষক) ছিলেন। ইজতিহাদ তথা গবেষণা ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাকলীদকে বর্জন করে ইজতিহাদের পন্থা অবলম্বন করায় সমসাময়িক মুকাল্লিদ সমর্থকদের সাথে তাঁর দ্বন্দ্ব-সংঘাতও হয়। কিন্তু তিনি মুজাদ্দিদ ছিলেন কিনা, সে বিষয়টি সুস্পষ্ট নয়। অন্যতম ইসলামী চিন্তাবিদ রশীদ রিজা তাঁকে হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ প্রসঙ্গে এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলামে বলা হয়েছে, Rashid Rida regarded him as the mudjaddid ÒRegenerator"of the 12th century A.H "রশিদ রিজা তাঁকে হিজরী দ্বাদশ শতকের মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।"[১৮৭]

শায়ক মুহাম্মাদ 'আব্দুহু তাঁর খ্যাতনামা তাফসীরুল কুরআনিল হাকীম, যা তাফসীর আল মানার নামে প্রসিদ্ধ, তাতেও আশ্ শাওকানীকে দ্বাদশ শতকের মুজাদ্দিদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাফসীর আল মানারে বলা হয়েছে,

امام الجليل المجدد مجتهد اليمن في القرن الثاني عشر محمد ابن علي الشوكاني

"দ্বাদশ শতকের বিশিষ্ট ইমাম, মুজাদ্দিদ, ইয়ামানের মুজতাহিদ মুহাম্মাদ ইবন 'আলী আশ্ শাওকানী"।[১৮৮] এ ছাড়া অন্য কেউ তাঁকে মুজাদ্দিদ বলে আখ্যায়িত করেছেন কিনা, তা জানা যায়নি।

প্রকৃতপক্ষে তিনি মুজাদ্দিদ ছিলেন কিনা, তা পর্যালোচনা সাপেক্ষ। আমরা নিম্নে সে বিষয়ে আলোকপাত করব, ইনশাআল্লাহ।

এজন্য প্রথমে আমরা মুজাদ্দিদের পরিচয়, প্রয়োজনীয়তা, মুজাদ্দিদের যোগ্যতা ও কর্মসূচী প্রভৃতির একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করব; অত:পর তার আলোকে যাচাই করে দেখব যে, তিনি প্রকৃত অর্থে মুজাদ্দিদ ছিলেন কিনা।

মুজাদ্দিদের প্রয়োজনীয়তা, পরিচয় ও কার্যাবলী

মানব জাতির জন্য আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন নির্দেশিকা

মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা নিখিল বিশ্বের যাবতীয় বস্তুরাজির সৃষ্টিকর্তা। তিনি শুধু সৃষ্টিই করেন নি, সাথে সাথে সেগুলোর জন্য নিয়ম-বিধানও ঠিক করে দিয়েছেন। কুরআন কারীমে তিনি ইরশাদ করেন, ربنا الذى اعطى كل شئ خلقه ثم هدى "আমাদের রব হলেন তিনি, যিনি প্রতিটি বস্তুকে আকৃতি দিয়েছেন অত:পর তার চলার পথও প্রদর্শন করেছেন। (ত্বাহা : ৫০)

---

১৮৭. The Encyclopaedia of Islam, vol. ix, p. 378.
১৮৮. শায়খ মুহাম্মাদ 'আব্দুহু, তাফসীরে আল মানার, খ. ৭, পৃ. ১৪৫।

সৃষ্টি জগতে মানুষ এবং জ্বিন ব্যতীত আর সবকিছুই প্রকৃতিগতভাবেই আল্লাহর নিয়ম-বিধান মেনে চলতে বাধ্য। কিন্তু মানুষের জন্য তিনি শর'ঈ বিধান প্রদান করেছেন এবং তা মানা বা না মানার স্বাধীনতাও দিয়েছেন। আল্লাহ প্রদত্ত এ স্বাধীনতার কারণে একদল তাঁর আইন-বিধান গ্রহণ করে সে আলোকে জীবন যাপন করছে এবং অন্যদল তাঁকে অমান্য করে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করছে। এর ফলে সত্য-সঠিক পথের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকার ভ্রান্ত পথেরও সৃষ্টি হয়েছে। এ সকল ভ্রান্ত পথ হতে সঠিক পথ নির্ণয় করা বান্দাহ্র জন্য কঠিন হতে পারে বিধায় আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং সত্য-সঠিক পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব নিয়েছেন।

তিনি ইরশাদ করেন, و على الله قصد السبيل و منها جائر "পথসমূহের মধ্যে যেহেতু বক্র পথও রয়েছে, সেহেতু সঠিক পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব আল্লাহর উপরই রয়েছে।" (আন্ নাহল : ৯)

আল্লাহ তা'আলা বান্দাহ্দেরকে তাঁর পছন্দনীয় পথ প্রদর্শনের যে দায়িত্ব নিয়েছেন, তার কারণেই তিনি যুগে যুগে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। একজন নবীর শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়ে যখন কোন জাতি গুমরাহীতে লিপ্ত হয়েছে, তখনই তিনি তাদেরকে সঠিক পথে আনয়নের জন্য আরেকজন নবী বা রাসূল প্রেরণ করেছেন। এভাবেই তিনি প্রত্যেক জাতিকে হিদায়াতের জন্য অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। কুরআনে বলা হয়েছে,

و ان من امة الا خلا فيها نذير "এমন কোন জাতি নেই, যাদের নিকট কোন সতর্ককারী আগমন করেন নি।" (ফাতির : ২৪)

নবুওয়াতের সর্বশেষ সংযোজন হলেন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তাঁর পর কিয়ামাত পর্যন্ত আর কোন নবী-রাসূল আগমন করবেন না। কারণ তাঁর উপর অবতীর্ণ কুরআনকে সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই গ্রহণ করেছেন।[১৮৯] ফলে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনীত শারী'আত কিয়ামাত পর্যন্ত চালু থাকবে এবং মানুষের জন্য আর কোন নতুন শারী'আতের প্রয়োজন হবে না।

কিন্তু পূর্ববর্তী উম্মাহ্দের মত নবীর শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে সামগ্রিকভাবে সম্পূর্ণ গুমরাহীতে নিমজ্জিত না হলেও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে বিজাতীয় সংস্কৃতি, কুসংস্কার এবং শিরক-বিদ'আতে লিপ্ত হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

ইসলামের সাথে জাহিলিয়াতের মিশ্রণ ঘটে গেলে খাঁটি ইসলামের উদভাসন ঘটানোর প্রয়োজন দেখা দেয়।

---

১৮৯. انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون "নিশ্চয়ই আমি স্মারক (কুরআন) নাযিল করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক। (আল হিজর : ৯)

মুজাদ্দিদ বা সংস্কারকের প্রয়োজন

এ কাজ করার প্রয়োজনে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাহ্দের মধ্য হতে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদেরকে প্রেরণ করেন, যাঁরা দ্বীনকে জাহিলিয়াতের মিশ্রণ থেকে পৃথক করে তার আসল প্রকৃতির উপর দাঁড় করিয়ে দেন। আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীছে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مأ ة سنة من يجدد لها دينها।

"নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা এ উম্মাতের জন্য প্রতি শতকের শিরোভাগে এমন লোক প্রেরণ করবেন, যিনি তাঁর জন্য তাঁর দ্বীনকে সবল ও সতেজ করবেন।"[১৯০]

মুজাদ্দিদ বা সংস্কারকের পরিচয়

মুজাদ্দিদ (المجدد) শব্দটি তাজদীদ (تجديد) বা তাজাদ্দুদ (تجدد) শব্দ হতে উৎসারিত হয়েছে। এ শব্দের অর্থ হলো, নতুনকরণ, নবায়ন, পুনরারম্ভ, সংস্কার।[১৯১] جدد الشيء– صيره جديدا জাদ্দাদাশ শাই অর্থ কোন বস্তুকে নতুনত্ব দান করা।[১৯২] ইংরেজীতে এর অর্থ করা হয়েছে, Renewal, Origination, Innovation, Reorganization, Reform, Renovation, Rstoration, Regeneration, Revival. মুজাদ্দিদ (مجدد) শব্দের অর্থ করা হয়েছে, Renewer, Innovator, Reformer অর্থাৎ নবায়নকারী বা সংস্কারক।[১৯৩]

কব্দটির মূল ধাতু হলো, د د ج বা جد । এর অর্থ কর্তন করা, সাধনা করা, গুরুত্ব প্রদান করা, ভাগ্যবান হওয়া, মহান হওয়া ইত্যাদি। এর মধ্যে প্রথম অর্থটিই আসল। কারণ কর্তন দ্বারাই বস্তু আবর্জনা ও জঞ্জাল মুক্ত হয়ে নতুনত্ব লাভ করে। তদ্রুপ আজেবাজে আবর্জনা, ময়লা-পংকিলতা ও অতিরিক্ত বিষয় বিদূরিত করবার সাধনা দ্বারাই বস্তুটি পরিচ্ছন্ন হয়। সাধনা ভাগ্যবান হওয়ার সোপান ও মাহাত্ম লাভের চাবিকাঠি।

الثوب الجديد অর্থ নতুন কাপড় অর্থাৎ যা তাতী সূতা কেটে অথবা দর্জি যা কেটে তৈরী করেছে। দিবস ও রজনী প্রতিবারে নতুন করে আসে বলে আরবীতে একে جديدان ও اجدان (দুই নিত্য নতুন) বলা হয়।

---

১৯০. সুলাইমান ইবন আশ'আছ, সুনানু আবি দাউদ, (দিল্লী : মাত.বা'উ মুজতাবাঈ, ১৩৪৬ হি.) কিতাবুল মালাহিম, খ. ২, পৃ. ২৪১।

১৯১. ড.ফজলুর রহমান, আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ৪ সং, ২০০৭ ইং) পৃ. ২০৭,২৯৭।

১৯২ . ৫৯. জুল ফাক্কার 'আলী, আল মু'জামুল ওয়াসীত (দেওবন্দ :যাকারিয়্যা বুক ডিপো, ২০০১ ইং) পৃ. ১০৯।

১৯৩. J Milton cowan, A dictionary of Modern written Arabic. p. 114

মোটকথা পুরাতনের পরিচ্ছন্নতা ও নতুনরূপে আত্মপ্রকাশের অর্থ এ শব্দমূলে রয়েছে। সময়ের ব্যবধানে এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিশত্রুর দ্বারা দ্বীনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট বাতিল মতবাদ ও বিদ'আত (কুসংস্কার) এর জঞ্জালমুক্ত করে দ্বীনকে এর মূলরূপে উপস্থাপনকে তাজদীদ এবং এই তাজদীদ সম্পাদনকারীকে মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) বলা হয়।[১৯৪]

পারিভাষিক অর্থ ঃ পরিভাষায় মুজাদ্দিদ বলা সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টিকে যিনি বা যাঁরা সময়ের বিবর্তন ও স্বার্থান্বেষীদের অসৎ উদ্দেশ্য সাধন অথবা অজ্ঞ দ্বীনী পুরুষদের ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ প্রক্রিয়ায় দ্বীনের মূল ধারায় অনুপ্রবিষ্ট গর্হিত ও নব উদভাবিত দ্বীন বিরোধী (বিদ'আত) বিষয়গুলিকে পরিশোধন ও সংস্কার করে দ্বীনকে এর মূল ও আদিরূপে আলা মিনহাজিন নবুওয়্যাহ অর্থাৎ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবীগণের যুগের পরিচ্ছন্নরূপে পুনর্বিন্যস্ত করেন। এক কথায় যিনি বা যাঁরা দ্বীনকে উহার সঠিকরূপে পুন:প্রতিষ্ঠিত করেন।[১৯৫]

মাওলানা 'আব্দুল হাই লাখনবী এ ব্যাপারে বলেন, "মুজাদ্দিদের জন্য শর্ত এই যে, তিনি বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ের 'আলিম হবেন। তাঁর পাঠদান, রচনা, লিখন ও ও'য়াজ-নসিহত দ্বারা ব্যাপক কল্যাণ ঘটবে; তিনি সুন্নাতের পুনরুত্থান ও বিদ'আত বিনাশে অতি কর্ম তৎপর থাকবেন।"[১৯৬]

মিশকাতুল মাসাবীহতে উল্লেখিত হাদীছে মুজাদ্দিদের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে,
يبين السنة عن البدعة و يكثر العلم و يعز اهله و يقمع البدعة و يكسر اهلها
"মুজাদ্দিদ হলেন তিনি, যিনি বিদ'আত থেকে সুন্নাহকে সুস্পষ্ট করবেন, জ্ঞানের বিস্তার ঘটাবেন ও জ্ঞানীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং বিদ'আতের মূলোৎপাটন ও বিদ'আতপন্থীদেরকে চূর্ণবিচূর্ণ করবেন।"[১৯৭]

একটি হাদীছেও মুজাদ্দিদের পরিচয় পাওয়া যায়। হাদীছটি বাইহাকীর কিতাবুল মাদখালের উদ্ধৃতিতে মিশকাতে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য হাদীছটির সনদ মুরসাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীছটি হলো,

عن ابراهيم بن عبد الرحمن العذري قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين

---

১৯৪. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৫ ইং) খ. ১৯, পৃ, ৬৭৮-৬৭৯।
১৯৫. প্রাগুক্ত, প. ৬৭৮।
১৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৩।
১৯৭. ওয়লী উদ্দীন মুহাম্মদ, শিকাতুল মাসাবীহ (দেওবন্দ : আল মাকতাবাতু আশরাফিয়া, তা.বি) পৃ. ৩৬, টীকা নং ২

ইবরাহীম ইবন 'আব্দুর রহমান আল্ 'উজরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, প্রত্যেক পরবর্তী যুগের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগণ এই 'ইলম (দ্বীনের জ্ঞান) বহন করবে, যারা সীমা লংঘনকারী বিদ'আতীদের বিকৃতি, বাতিলপন্থীদের মিথ্যারোপ ও মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে দ্বীনকে পরিচ্ছন্ন করবেন।[১৯৮]

'আল্লামা তাকী 'উছমানী উল্লেখিত হাদীছে তাজদীদ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, The act of "renovetion of the religion" mentioned in this hadith has been reffered to by word `Tajdid', it means the restoration of the original beliefs and practices after their being changed, distorted or forgotten.

"উল্লেখিত হাদীছে তাজদীদ শব্দ দ্বারা যে ধর্মীয় সংস্কারের কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হলো, কোন বিশ্বাস বা 'আমল বিকৃত, বিলুপ্ত বা বিস্মৃত হওয়ার পর তাকে আবার তার আসল অবস্থায় পুনস্থাপন করা।"[১৯৯]

তিনি আরো বলেন, Allah will send a person or persons who will correct the error, restore the original beliefs and practices and explain the true intent of shari`ah. This act of renovation is called Tajdeed and those who carry out this remarkable work are named as mujaddids (renovator).

"আল্লাহ এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে প্রেরণ করবেন, যে বা যাঁরা আসল বিশ্বাস ও 'আমলকে পুনস্থাপন করবেন এবং শারী'আতের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন। এ সংস্কারের কাজকে তাজদীদ এবং যাঁরা এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করেন, তাঁরাই মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক নামে অভিহিত হয়ে থাকেন।"[২০০]

মুজাদ্দিদ এর সংজ্ঞায় উইকিপিডিয়াতে বলা হয়েছে,

A person who appears at turn of evry century of the Islamic calendar to revive Islam, remove from it any extraneous elements and restore pristine purity.

"মুজাদ্দিদ হলেন তিনি, যিনি ইসলামী পঞ্জিকার প্রতি শতাব্দীর শুরুতে আবির্ভূত হয়ে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করেন, বহিরাগত উপাদানসমূহ দূরিভূত করেন এবং পূর্ববর্তী নির্ভেজাল অবস্থায় পুনস্থাপন করেন।"[২০১]

---

১৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।
১৯৯. উইকিপিডিয়া, ইন্টারনেট সংস্করণ। মুজাদ্দদি ও তাজদীদ দ্র.
২০০. প্রাগুক্ত।
২০১. প্রাগুক্ত।

মুজাদ্দিদ বা সংস্কারকের পরিচয় দিতে গিয়ে সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী বলেন, "মুজাদ্দিদ হন স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী। সত্য উপলব্ধি করার মত গভীর দৃষ্টি তাঁর সহজাত। সব রকমের বক্রতা দোষমুক্ত সরল বুদ্ধিবৃত্তিতে তাঁর মনোজগত পরিপূর্ণ। প্রান্তিকতার বিপদমুক্ত হয়ে মধ্য পন্থা অবলম্বনের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের ভারসাম্য রক্ষা করার বিশেষ যোগ্যতা তাঁর বৈশিষ্ট্য। নিজের পরিবেশ এবং শতাব্দীর পুঞ্জিভূত ও প্রতিষ্ঠিত বিদ্বেষমুক্ত হয়ে চিন্তা করার শক্তি, যুগের বিকৃত গতিধারার সংগে যুদ্ধ করার ক্ষমতা ও সাহস, নেতৃত্বের জন্মগত যোগ্যতা এবং ইজতিহাদ ও পুনর্গঠনের অস্বাভাবিক ক্ষমতা মুজাদ্দিদের স্বকীয় বস্তু। এ ছাড়া ইসলাম সম্পর্কে তিনি হন দ্বিধামুক্ত পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। দৃষ্টিভঙ্গি ও বুদ্ধি-জ্ঞানের দিক দিয়ে তিনি হন পূর্ণ মুসলিম। সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর খুঁটিনাটি ব্যাপারে ইসলাম ও জাহিলিয়াতের মধ্যে পার্থক্য করা এবং অনুসন্ধান চালিয়ে দীর্ঘকালের জটিল আবর্ত থেকে সত্যকে উঠিয়ে নেয়া মুজাদ্দিদের কাজ। এ সব বিশেষ গুণের অধিকারী না হয়ে কেউ মুজাদ্দিদ হতে পারে না।"[২০২]

সংস্কারকের কাজ

জাহিলিয়াতের পংকিলতা থেকে ইসলামকে নির্মল ও নির্ভেজাল করাই সংস্কারকের কাজ। ইসলামের মধ্যে যেখানে যতটুকু জাহিলিয়াতের সংমিশ্রণ বা অনুপ্রবেশ ঘটে, তা থেকে মুক্ত করে ইসলামকে তার সত্যিকার আকৃতিতে পুনর্বার প্রতিস্থাপিত করার প্রচেষ্টা চালানোই সংস্কারকের দায়িত্ব। কোন অভিনব কাজ করার নাম সংস্কার নয়।

সংস্কারক মূলত: নিম্নলিখিত কাজগুলো করে থাকেন :

১. নিজের পরিবেশের নির্ভুল চিত্রাংকন। অর্থাৎ পরিস্থিতি ভালভাবে পর্যালোচনা করে জাহিলিয়াত কোথায় কতটুকু কিভাবে অনুপ্রবেশ করেছে, তার শিকড় কোথায় এবং কতদূর বিস্তৃত, ইসলামের অবস্থা বর্তমানে কোন পর্যায়ে এ সব বিষয় সঠিকভাবে বুঝে নেয়া।

২. সংস্কারের পরিকল্পনা প্রণয়ন। অর্থাৎ কোথায় আঘাত করলে জাহিলিয়াত নির্মূল হয়ে ইসলাম পুনর্বার সমাজে কর্তৃত্ব করার সুযোগ পাবে তা নির্ধারণ করা।

৩. নিজের সামর্থ পরিমাপ করা। অর্থাৎ তিনি কতটুকু শক্তির অধিকারী এবং কোন পথে সংস্কার করার শক্তি তাঁর রয়েছে, এর নির্ভুল আন্দাজ করা।

৪. চিন্তার রাজ্যে বিপ্লব সৃষ্টির চেষ্টা করা। মানুষের 'আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা ও নৈতিক

---

২০২. সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী, তাজদীদ ওয়া এহ্ইয়ায়েদীন, অনুবাদক আব্দুল মান্নান তালিব, ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন, (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ৯ সং, ২০০৫ ইং) পৃ. ২৫-২৬।

দৃষ্টিভঙ্গিকে ইসলামের ছাঁচে গড়ে তোলা এবং শিক্ষা ও অনুশীলন ব্যবস্থার সংস্কার সাধন, ইসলামী শিক্ষাকে পুনর্জীবিত করা এবং সামগ্রিকভাবে ইসলামী মানসিকতাকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করে চিন্তার পরিবর্তন সাধন করা।

৫. সক্রিয় সংস্কার প্রচেষ্টা। অর্থাৎ জাহিলী রসম-রেওয়াজসমূহ খতম করে দেয়া, নৈতিক চরিত্র ও বৃত্তিসমূহকে পরিচ্ছন্ন করা, মানুষের মধ্যে পুনর্বার শারী'আতের আনুগত্যের প্রবল প্রেরণা সৃষ্টি করা এবং পূর্ণ ইসলামী নেতৃত্বদানের মত লোক তৈরী করা।

৬. দ্বীনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করার চেষ্টা করা। অর্থাৎ কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতির আলোকে গবেষণা করে ইসলামকে যুগোপযোগী করে উপস্থাপন করা, যাতে শারী'আতের উদ্দেশ্যসমূহ পূর্ণ হয় এবং তমদ্দুনের নির্ভুল উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইসলাম দুনিয়াকে নেতৃত্ব দান করতে সক্ষম হয়।

৭. প্রতিরক্ষামূলক প্রচেষ্টা। অর্থাৎ ইসলামকে নির্মূল করতে উদ্যত রাজনৈতিক শক্তির মুকাবিলা করা এবং তার শক্তি নির্মূল করে ইসলামের বিকাশের পথ প্রশস্ত করা।

৮. ইসলামী ব্যবস্থার পুনর্জীবন। অর্থাৎ জাহিলিয়াতের হাত থেকে কর্তৃত্বের চাবিকাঠি ছিনিয়ে নিয়ে সরকারকে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বর্ণিত খিলাফাতের উপর পুন:প্রতিষ্ঠিত করা।

৯. বিশ্বজনীন বিপ্লব সৃষ্টি। অর্থাৎ কোন একটি নির্দিষ্ট দেশে সীমাবদ্ধ না থেকে বিশ্ব জনীন শক্তিশালী আন্দোলন সৃষ্টি করা, যাতে ইসলামের সংস্কারমূলক বিপ্লবী দা'ওয়াত সাধারণ্যে বিস্তার লাভ করে এবং ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং নৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব সমগ্র দুনিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়।[২০৩]

উল্লেখিত কার্যাবলীর মধ্যে প্রথম তিনটি সকল সংস্কারকের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অবশিষ্টগুলোর সবক'টি একজন সংস্কারকের মধ্যে থাকা জরুরী নয়। বরং তন্মধ্য হতে একটি, দু'টি বা ততোধিক বিভাগে উল্লেখযোগ্য কাজ করলে তাঁকেও মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক গণ্য করা যেতে পারে। তবে উল্লেখিত সকল কাজ যিনি আঞ্জাম দেন তিনিই হলেন পূর্ণাঙ্গ মুজাদ্দিদ।

উপরোল্লিখিত মানদন্ডে বিচার করলে বলা যায় যে, 'আল্লামা আশ্ শাওকানী একজন বড় মাপের গবেষক ছিলেন বটে, কিন্তু তাজদীদ বা পুনর্জাগরণের জন্য সার্বিক সংস্কারমূলক

---

২০৩. প্রাগুক্ত।

কর্মসূচী গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করতে পারেন নি। তিনি দ্বীনের নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। একজন বড় মাপের লেখক, শিক্ষক ও চিন্তাবিদ ছিলেন। তাঁর বিশাল সংখ্যক ছাত্রের মাধ্যমে তিনি দ্বীনের দাও'য়াত সম্প্রসারণের উদ্যোগও নিয়েছিলেন। কিন্তু সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মা''মে সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেছেন তেমনটি লক্ষ্য করা যায় না।

তিনি তাফসীর, হাদীছ, ফিকহসহ প্রায় সকল বিষয়ে গবেষণা করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ও ইমামের মর্যাদা লাভ করতে পেরেছিলেন বটে, কিন্তু সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিপ্লব ও সংস্কার সাধনের মত সর্বাত্মক কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন নি।

তাঁর সংস্কারমূলক কার্যাবলীর মধ্যে তাকলীদ বর্জন করে ইজতিহাদের দিকে আহবান, কবর পূজা, মাযার পূজা প্রভৃতি শিরক, বিদ'আতের বিরুদ্ধে কঠোর বক্তব্য প্রদান উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এগুলোর মূলোৎপাটনের জন্য তিনি কার্যকর কোন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ ও সক্রিয় কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন নি।

অধিকন্তু তাঁর এ সকল প্রচেষ্টা শুধুমাত্র ইয়ামানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ ক্ষেত্রে তিনি সর্বজনীন এবং বিশ্বব্যাপী কোন সুসংগঠিত আন্দোলন পরিচালনা করতে সক্ষম হননি।

এ সকল দিক বিবেচনায় 'আল্লামা আশ্ শাওকানীকে একজন বড় মাপের মুজতাহিদের পাশাপাশি একজন মুসলিহ্ বা সংশোধনকারী হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়, কিন্তু মুজাদ্দিদ বা সাধারণ ও সর্বব্যাপক সংস্কারক হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না।

উপসংহার

হিজরী দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর জ্ঞানাকাশে 'আল্লামা আশ্ শাওকানী ছিলেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর গোটা জীবন তিনি জ্ঞান চর্চায় অতিবাহিত করেছেন। চিন্তার বিভ্রান্তি ও অনুকরণপ্রিয়তার বেড়াজাল ছিন্ন করে তিনি পরিশুদ্ধ ও মুক্ত চিন্তার জগতে বিচরণ করেছেন।

তাঁর লব্ধ জ্ঞান যেমন সমসাময়িককালে জ্ঞানপিপাসুদের তৃষ্ণা নিবারণ করেছে, অনুরূপভাবে তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলীও অদ্যাবধি মুসলিম উম্মাহর সঠিক জ্ঞানের অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

তাঁর সকল লেখা কুরআন-সুন্নাহর দলীল দ্বারা সমর্থিত বিধায় ইসলামী চিন্তা-বিদদের জন্য তা খুবই সহায়ক ও উপকারী।

এ মহান ব্যক্তির কর্মময় জীবনকথা ও চিন্তাধারা আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করুক, এ প্রত্যাশাই করছি।

--০--